সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত; কিন্তু বেদব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না; রাজার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন ও গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিত। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় তথায় সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার * * * ইঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনারূপ পরম ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলেন। ...... ভূকৈলাশের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে এক এক বার ব্রাহ্মসমাজ হয়। ১৭৪১ শকের পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চোবে আপনার তুলাবাজারের বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ আহ্বান করিলেন; তাহাতে......রাজা রাধাকান্ত দেব......প্রভৃতি অনেক ধনবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শকের আশ্বিন সংখ্যা দেখ)।

... ... "পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ১৭৫১। ১১ই মাঘ তারিখে ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহে স্থায়ীভাবে যে প্রকাশ্য ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত পরিপূর্ণ আবির্ভাবকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়া মহর্ষি ঠিক ঐ দিন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের আয়ুষ্কাল গণনা করিতে আরম্ভ করেন। এক ভাবে বলিতে গেলে ১৭৩৭ শকের আত্মীয়সভা বা ১৭৫০। ৬ই ভাদ্র হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিকাশোন্মুখে অবস্থা এবং ১৭৫১।১১ মাঘেই তাহার নিজস্ব ও স্থায়ী গৃহে উহার সম্পূর্ণ বিকাশ।"

১৮৫০ শ্রাবণ—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিত "ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী" প্রবন্ধে—"১৭৩৭ শকে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার মাণিকতলার উদ্যানে আত্মীয়সভা স্থাপন করেন এবং উক্ত সভা নানা স্থানে পরে স্থানান্তরিত হয়। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার নির্ব্বাহক ছিলেন। ১৭৩৯ শকে রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুপ্রীম কোর্টে এক মকদ্দমা আনয়ন করায় এবং রাজা ৩ বৎসর ধরিয়া তাহাতে বিব্রত হইয়া পড়ায় আত্মীয়সভার অধিবেশন আর হইত না। রাজা ঐ অন্যায় অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া ১৭৪১ শকে উহা আবার জাগাইয়া তোলেন। অন্যান্য অধিবেশনের মধ্যে উহার এক অধিবেশন বৃন্দাবন মিত্রের গৃহে, আর এক অধিবেশন ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে এবং আর একটী অধিবেশন ১৭৪১ শকের পৌষ মাসে তুলাবাজারের শ্রীবিহারীলাল চোবের বাটীতে হইয়াছিল।

"আত্মীয়সভা উঠিয়া গেলে ১৭৪৯ শকে রাজা * * এডাম সাহেবের সভায় ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেন। * * ১৭৫০ ভাদ্র মাসে জোড়াসাঁকোস্থিত কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। * * ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ তারিখে নিজ গৃহে ব্রাহ্মসমাজ স্থানান্তরিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল ও তাহার ট্রষ্টডীড লিপিবদ্ধ হইল। বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে কমল বসুর বাটীর সমাজ আত্মীয় সভার অনুবৃত্তি মাত্র। * * * ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র হইতে কমল বসুর বাটীতে যে উপাসনা আরম্ভ হয় তাহা ১৭৫১। ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত যে অবিশ্রান্তভাবে চলিয়াছিল তৎসম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দিহান।"

"শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবু আপনার মত সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার প্রবন্ধের (The Brahmo Somaj centenary of 1928) ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আত্মীয় সভা Private meeting ground for Ram Mohan and his friends"। একথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। "আত্মীয়" নাম দেখিয়া তিনি private বলিতে সাহসী হইয়াছেন। (১৭৬৯ শকের আশ্বিন) সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভাল করিয়া পাঠ করিলে অন্যরূপ বুঝায়।" * * * "বৃন্দাবন মিত্র, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বিহারীলাল চোবের বাটীতে যে আত্মীয়সভার অধিবেশন হয় তাহাকে private বলা যায় না।" "কমল বসুর বাটীতে উপাসনাকালে যে পর্দ্দা উঠিয়া গিয়াছিল, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই। ট্রষ্টীনিয়োগ যাহা হইয়াছিল তাহা আদিব্রাহ্মসমাজের নূতন গৃহ সম্বন্ধেই হইয়াছিল।"

"আমরা ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্রকে বহুদিন হইতে উচ্চ স্থান দিয়া থাকি, কিন্তু ১৭৮৭ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যে প্রেরিত পত্র বাহির হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী তিন সংখ্যায় ঐ পত্রের যে অনুক্রম চলিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের অন্যরূপ ধারণা হয়।... ...পত্রপ্রেরকের নাম প্রকাশিত না থাকিলেও আমাদের মনে হয় ইনি চন্দ্রশেখর দেব (ইহা আমরা ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি)।... ... তিনি তাঁহার চারখানি পত্রের কোনটীতে কমলবসুর বাটীর সমাজের উল্লেখ করেন নাই বা ৬ই ভাদ্র যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন তাহার কিছুমাত্র পরিচয় দেন নাই। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, ১৭৫১। ১১ই মাঘই ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন। প্রকৃতপক্ষে যে উদার ভিত্তির উপর ১৭৫১। ১১ই মাঘের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও যাহার বিশেষ পরিচয় আদিব্রাহ্মসমাজের অপূর্ব্ব ট্রষ্টডিডে দেখিতে পাই, তাহার অনুরূপ নিদর্শন "আত্মীয়সভা" বা কমলবসুর বাটীর প্রতিষ্ঠিত সভায় দেখিতে পাওয়া যায় না, বা তদ্রূপ কোন কথা ঘোষিত হয় নাই।... ... পত্রপ্রেরক সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ১৭৫১। ১১ই মাঘই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন। উক্ত পত্রে ১৭৫০। ৬ই ভাদ্রের একেবারেই উল্লেখ নাই।"

"বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র তারিখে যে ব্যাখ্যান দেন তাহার শিরোভাগে "ব্রাহ্মসমাজ" এই কথাটী লেখা আছে। কিন্তু ঈশানবাবু বিদ্যাবাগীশের যে ১৬টী ব্যাখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোনটীর শিরোভাগে "ব্রাহ্মসমাজ" এই কথাটীর উল্লেখ নাই। ব্যাখ্যানগুলি অনেকদিন পরে ক্রমে ক্রমে পুনর্মুদ্রিত হইবার সময় পরবর্ত্তী প্রকাশক দ্বারা "ব্রাহ্মসমাজ" নামটী সংযোজিত হইয়া থাকিবে। ঈশানবাবু ঐ পুনর্মুদ্রিত কপিতে "ব্রাহ্মসমাজ" নাম দেখিয়া থাকিবেন।"

১৮৫০, ভাদ্র—ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিত—"১৭৩৭ শকে আত্মীয়সভার যে সূচনা হয় তাহাতে শিবচন্দ্র মিশ্র বেদপাঠ করিতেন, গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন। ঈশানবাবুর পুস্তকে দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উহাতে ব্যাখ্যান দিতেন। ১৭৫০ শকে ভাদ্রমাসে কমলবসুর বাটীতে যে সমাজ আরম্ভ হয়, তাহাতে দুইজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন।"

[আমরা এইবারে ১৭৮৯ শক অবধি ১৮৫১ শকের শ্রাবণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় যাহা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম। চিন্তামণি বাবুর এই বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধগুলি সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতে বর্ত্তমান বৎসরের শ্রাবণ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের মত কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই যে, ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘকেই ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার দিন ধরিয়া বর্ত্তমান বৎসরকেই ব্রাহ্মসমাজের শততম বৎসর ধরা উচিত। শিশু যখন মাতার গর্ভে থাকে তখন অবধি তাহার জন্ম বিশেষ কারণ ব্যতীত কেহ ধরে না; ভূমিষ্ঠ হইবার দিন অবধিই তাহার জন্মদিবসের গণনা করা হয়। তঃ সং]

——

বুদ্ধের গৃহত্যাগ।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

"ক্ষণস্থায়ী দ্বিদল জীবন,"

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে গৌতম ভাবিতে লাগিলেন,—

"ক্ষণস্থায়ী দ্বিদল জীবন,
অর্দ্ধ সচেতন—অর্দ্ধ অচেতন
কেবা জানে কিবা ভাব?
এই বামাদলে কুতূহলে
নাচিল গাইল,
নানা বেশে আবেশে অবশ তনু,
হাবভাব দেখাইল কত,
পুনঃ কি বিকৃত ভাব!
সংজ্ঞাহীন—নাহিক উৎসব,
শব সম নিপতিত!" *

পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট গৌতম নর্ত্তকীগণের বিশ্রী মুখভঙ্গী, উৎকট অঙ্গভঙ্গী, অসংযত আবরণ, কাহারো বা মুখের লালানির্গমন যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তর ভরিয়া ঘৃণা জাগিতে লাগিল—তাঁহার সমস্ত রূপমোহ কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে সেই ভিক্ষুর সৌম্য শান্তমূর্ত্তি তাঁহার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। গৌতম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ছন্দকের সমীপবর্ত্তী হইয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন—'ছন্দক'। তন্দ্রাবিষ্ট ছন্দক ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ছন্দক, অশ্ব প্রস্তুত কর।"

ভাব-বিহ্বল ছন্দক দ্বিরুক্তি না করিয়া অশ্বশালায় প্রবেশ করিল। গৌতমের মনে জাগিল—'আমার পুত্র, আমার প্রিয়তমা যশোধরা!' গৌতম যশোধরার গৃহাভিমুখে চলিলেন। সন্তর্পণে সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া সদ্যোজাত শিশুর মুখপানে চাহিলেন। বড় সাধ জাগিল একবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লন। কিন্তু যশোধরার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় অন্তরের ব্যাকুল বাসনা অন্তরেই চাপিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন। সোপান-প্রান্ত হইতে শেষবার প্রেমময়ী পত্নী ও নয়নমণি শিশুপুত্রের মুখের প্রতি ব্যথিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাণপিয়াসী ধীরে ধীরে অশ্বশালাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অশ্ব প্রস্তুত। গৌতম আবেগভরে ডাকিলেন—'কন্থক'। কন্থক করুণনেত্রে চাহিল।

"কন্থক, আজ আমার সহায় হও—আমার বুদ্ধত্বলাভের সহায় হও।"

গৌতম অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ছন্দক তাঁহার পশ্চাতে বসিল। অতিকায় অশ্ব মহানন্দে বিমানবিকম্পী হ্রেষারব করিয়া গন্তব্যপথে ছুটিল। নগরবাসীর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দেবগণ সেই রব বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। কন্থকের পদশব্দে যাহাতে কোন প্রহরী জাগিয়া না উঠে, সেই জন্য দেবগণ তাহার প্রতি পদবিক্ষেপে পদতলে নিজ নিজ হাত পাতিয়া দিতে লাগিলেন। নগরবাসী কেহ জানিতেও পারিল না, গৌতম কখন নগর-তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নগরপ্রান্তে বিশাল তোরণ। উন্মোচন করিতে সহস্র জনের প্রয়োজন। গৌতম ভাবিতেছেন যেমন করিয়াই হউক তিনি তোরণ খুলিবেন; ছন্দক ভাবিল

* "বুদ্ধদেবচরিত"—গিরীশচন্দ্র।

যে প্রকারেই হউক পার হইতেই হইবে; কন্থক ভাবিল গৌতম ও ছন্দক সহ এক লম্ফে তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। দেবগণ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ধরিলেন। * নগর হইতে বাহিরে পলাতক সতৃষ্ণনয়নে একবার নগরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইলে আপন প্রভাবের সমূহ ক্ষতি হইবে এই আশঙ্কায়, পাপরাজ বশবর্ত্তী (বসবত্তি) মার বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবসর বুঝিয়া তিনি এইবারে অবিলম্বে গৌতম সমীপে উপস্থিত হইলেন।

"কোথায় যাইতেছ কুমার? আর সপ্তদিবস পরেই তুমি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হইবে।"

"কে তুমি?"

"ষষ্ঠ দেবলোকের অধিপতি পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী।"

"সেই হও, প্রস্থান কর। আমি রাজচক্রবর্ত্তি-পদ চাহিনা। আমি চাই 'বুদ্ধত্ব'। তুমি যাহা বলিলে তাহার সহস্রগুণ লাভও আজ আমার কাছে অতি তুচ্ছ।"

মার বিমানপথে উঠিতে উঠিতে বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল—

"দেখিয়া লইব, তুমি কেমনে বুদ্ধ হও। এখন হইতে ছায়ার মতো আমি তোমাকে অনুসরণ করিব। তোমার মনে ছিদ্রমাত্র পাইলেই, আমি তদবলম্বনে তুমুল ঝটিকা তুলিব।"

অদৃশ্যে রহিয়া মার অবিচলিত গৌতমের অনুসরণ করিলেন। †

নগরের সীমারেখা তখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। গৌতম আর একবার প্রিয় জন্মভূমিকে দেখিয়া লইলেন। ক্রমে সকলে 'অনোমা' নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীর নাম শুনিয়া গৌতম উল্লাসিত হইলেন। তাঁহার দীক্ষাও তবে 'অনোমা', উজ্জ্বল হইবে মনে করিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ‡ কন্থক গৌতম ও ছন্দকসহ লম্ফ দিয়া নদী উত্তীর্ণ হইল। গৌতম অবতরণ করিলেন। একে একে সমস্ত আভরণ উন্মোচন করিয়া তিনি ছন্দকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ছন্দক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল।

"যাও ছন্দক।"

"আমিও যাইব।"

"কোথায়?"

"তোমার সঙ্গে।"

"এ রত্নালঙ্কার সকলের কি হইবে তবে?
কন্থকেরই-বা কি হইবে?"

ছন্দক কোন উত্তর করিল না।

"যাও ছন্দক, আমার মর্ম্মাহত পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিও, আমার দুঃখিনী প্রিয়তমাকে প্রবোধ দিও, আর আমার রাহুল—তার যত্ন নিও ছন্দক। তুমি না যাইলে এসকল হইবে না। শাক্যগণকে শোক করিতে নিষেধ করিও। সকলকে বলিবে তাহাদের সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বলাভের আশায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে।"

ছন্দক আনত মস্তকে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

"শোক করিও না ছন্দক। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। এখন ফিরিয়া যাও।"

ছন্দকের বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু শোকাবেগ চাপিয়া প্রতিগমনে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

দীর্ঘ কেশ রাখা ভিক্ষুর পক্ষে অশোভন। গৌতম তরবারি সাহায্যে কেশ কর্ত্তন করিলেন। তাঁহার খেয়াল জাগিল বুদ্ধত্বলাভ সম্ভব কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

সম্ভব হইলে কেশরাশি ভূমিষ্ঠ হইবে না; মনে করিয়া তিনি শিরোভূষণ সহ কেশদাম ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুই ফিরিয়া আসিল না। সকলের অলক্ষিতে শক্র তৎসমুদয় স্বর্ণপেটিকায় গ্রহণ করিয়া স্বধামে লইয়া গেলেন।

প্রভুবিচ্ছেদ ঘটিবে ভাবিয়া কন্থক মর্ম্মাহত হইয়াছিল। দেখিয়া শুনিয়া সে আর সহ্য করিতে পারিল না, সেইস্থানে প্রাণত্যাগ করিল। ছন্দকের শোকাগ্নিতে ঘৃতাহুতি হইল। গৌতম একবার মৃত কন্থকের প্রতি, আর একবার শোকার্ত্ত ছন্দকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস অন্তরে চাপিয়া লইলেন।

বহুমূল্য বস্ত্রাদি আর তাঁহার শোভা পায় না। তিনি তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা-প্রেরিত ত্রি-চীবর পরিধান করিলেন। ছন্দককে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া, ব্রহ্মা-দত্ত দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে নবীন ভিক্ষু ধীর পদনিক্ষেপে 'অনুপিয়ের' আম্রবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শোকাভিভূত ছন্দক কিছুক্ষণ একদৃষ্টে প্রিয়তমের প্রতি চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রত্নালঙ্কারাদি সহ কপিলবস্তু অভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

---

* পলায়নক্রিয়া বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল এবং নগরতোরণ ঘটনাক্রমে উন্মুক্তই পাওয়া গিয়াছিল, এইমাত্র বিশ্বাস করিলেই চলিবে।

† নগর-তোরণ হইতে নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুদ্ধের মনে রাজ্যাভিলাষ জাগিয়াছিল। হয়তো বা জ্যোতিষীগণের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণীও মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া জগতের হিতকামনাই বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নীচ বাসনার জন্য আপনার মনকে ভৎর্সনা করিলেন। ঘটনাটি এই ভাবেই বুঝিতে হইবে। সমষ্টিভূত মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলিকে রূপদান করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রকার "মার" পরিকল্পনা করিয়াছেন।

কাহারো মতে গৌতম যখন যশোধরা ও শিশুপুত্রকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন "মার" তখনও প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। M. of B. Hardy pp. 106-10.

‡ For a discussion on the significance of 'অনোমা' see Cunningham—Ancient. Geography of India pp. 488-89.

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

কীর্ত্তন।

যেমন ক'রে পারি হরি, ডাকতে তোমায় ছাড়ব না।
তোমার কথা ছাড়া আমি আর কোন কথা কইব না।
শিশুর আধ আধ বাণী বুঝে না কি তার জননী
[তার মা বিনে কেউ বুঝে না]
ওগো তেমনি আমার অফুট বাণী তুমি কি গো বুঝবে না।
তোমার কাজে তোমার মাঝে ডুবে রব এ সংসারে
[শত কোলাহলে ভুলে শান্ত মনে]
ওগো যে যা বলে বলুক আমায় তোমার চরণ ছাড়বো না।
স্বপ্রকাশ বোলে তোমায় ডেকে ফিরে কেহ না যায়
[তোমায় ডাকলে এসে দাও হে দেখা]
আমি সাধনভজন-বিহীন হ'লেও,
তোমার আশা করতে ছাড়ব না।
সবার ভার নিয়েছ নিজে আর আমার কি ভাবনা আছে,
[তাই বিশ্বম্ভর তোমায় বলে]
ওগো আপন শিরে আপন বোঝা আর তো আমি বইব না।
আকাশে ভূতলে জলে অযুত গগন-তলে,
[তোমার অনন্ত রূপ বিশ্বব্যাপী]
তোমার সত্যং শিব সুন্দর রূপ দেখতে কারুর নাই মানা।
অপরূপ মোহন সাজে, দাঁড়াও গো হৃদয়মাঝে
[একবার দেখে লই তোমায় নয়ন ভরে]
আমি আনন্দময় হ'য়ে রব আর দুঃখের কথা বলব না।
এ জীবনের ধ্রুবতারা কে আছে তোমা ছাড়া
[এ সংসার-জলধি মাঝে]
আমি তোমা পানে রাখবো নয়ন
আর কোন দিকে চাইব না।

বেহাগ—তেতালা।

পরাণ ছুটে তোমার পানে
দিবস-রজনী
প্রিয়তম, যেমন তটিনী
ধায় সিন্ধু পানে।
প্রাণনাথ হে মোরে দেখা দাও
আঁখিজলে আকুল নয়ন।

শ্রীক্ষি, না, ঠা.

কীর্ত্তন।

প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত
কৃপাভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ।
[দেখা পাব বলে—ত্রাণ পাব ব'লে—চরণ পাব ব'লে]
আমি পাপেতে তাপিত হ'য়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়া।
[ওহে পতিতপাবন]
প্রভু স্থান দাও তব চরণতলে,
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে।
[ওহে অধমতারণ]
প্রভু কৃপাসিন্ধু তব নাম, আমায় কৃপাবারি কর' হে দান।
[ওহে কৃপাময়]

—

নানা কথা।

ভাদ্রোৎসব—এবার ভাদ্রোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে একটী বিষয় আমরা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ ইহা সে সময়ে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং অনেকেরই উহা আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। সম্মিলিত উপাসনা প্রভৃতির জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে ইংরাজী ও বাংলা আহ্বানপত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতে ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার "President Sadharan Brahmo Somaj and Secretary Brahma Somaj Centenary Committee" বলিয়া ইংরাজিতে এবং "সভাপতি সাঃ ব্রাঃ সমাজ, ও সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব কমিটি" বলিয়া বাংলায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহাতে জনসাধারণকে ভ্রান্ত ধারণা করানো হয় যে হেমবাবু বিভিন্ন শাখা কর্তৃক উৎসব কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এরূপ ভ্রমপূর্ণ উক্তি দ্বারা কি ঐতিহাসিক কি সমাজসংক্রান্ত সকল দিক হইতেই ব্রাহ্মসমাজেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আসে। ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে যে মিলনের ভাব আনা হইতেছিল, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা দ্বারা উহা ঘুচিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিরোধের বিষকণ্টক রোপিত করা হয়। আমরা ইহা ইচ্ছা করি না। অবশ্য ডাক্তার সরকার যদি মাত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামে উহা বলিতেন, তবে আমাদের কিছুই বলিবার ছিল না। আমরা এবিষয়ের বিচারের ভার ডাক্তার সরকারের নিজের উপর এবং সাধারণ সমাজের কর্তৃপক্ষের উপর সম্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

দ্বিতীয় কথা এই যে, আহ্বানপত্রের শিরে "একাধিক শততম" ভাদ্রোৎসব লিখিত হইয়াছে। ইহা যখন সর্ব্ববাদ-সম্মত হয় নাই তখন এই ভাদ্রোৎসবকে "একশততম" বলিয়া "একাধিক শততম" না বলিলেই ছিল ভাল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে গত কয়েক সংখ্যায় "ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ" যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিবিষ্টচিত্তে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলেই যে কেহ বুঝিতে পারিবেন যে, এইভাবে আহ্বানপত্রাদি বাহির করিয়া বিরোধের ভিত্তি স্থাপন করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। মিলনের পথে এরূপ pinprick রোপণ করিলে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মিলনের আশা সুদূরপরাহত। তাহার ফলে কোন একটী শাখায় নহে, কিন্তু সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে দুর্ব্বলতা আসা অপরিহার্য্য। তাই নিতান্ত দুঃখের সহিত অশ্রুপাতের সঙ্গে কথাগুলি বলিলাম—ডাক্তার সরকার ও সাধারণ সমাজের কর্তৃপক্ষ এগুলির প্রতি সুদৃষ্টিপূর্ব্বক আলোচনা করিলে সুখী হইব। এখানে prestigeএর কোন কথা নাই, মাত্র ঐতিহাসিক সত্যের কথা এবং বিরোধ অপনয়নের কথা আছে।

খাসমহলের নূতন সেটেলমেণ্ট—নূতন সেটেলমেণ্টের ফলে করবৃদ্ধির কারণে বারদৌলির ন্যায় চারিদিক হইতেই ক্রন্দনের আর্ত্তনাদ আসিয়া আমাদের কানে পৌঁছিতেছে। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে খুব জোরের সঙ্গে বলিতে পারি, the cup is full and

cannot hold another drop—পেয়ালা ভর্ত্তি, আর এক বিন্দুও করবৃদ্ধি ধারণ করিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের কানে প্রজাদের অবস্থার কথা ঠিক পৌঁছায় কি না জানি না; আমরা কিন্তু জানি যে প্রজারা বর্ত্তমান করভারই বহিতে অসমর্থ, করবৃদ্ধি তো দূরের কথা। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের দৈন্য অদৈন্য কিরূপে স্থির করেন তাহা কিছু পূর্ব্বে একটা সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম। এত মণ রূপা বা সোনা বিদেশ থেকে ভারতে আমদানী হয়েছে এবং এত মণ রপ্তানি হয়েছে; তবেই দাঁড়াল এই—উভয়ের মধ্যে বাদ কাটিলে এত মণ রূপা বা সোনা ভারতবাসীরা পাইয়া ফেলিয়াছে। ঘরে টাকা না থাকিলে এত মণ রূপা বা সোনা ভারতবাসী থাইতে পারে না। সুতরাং স্পষ্টতমরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে ভারতবাসীরা অতি ধনী এবং ধনরত্নের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে! হয়তো রাজা মহারাজা বা ধনী কয়েকজনের কল্যাণে ঐ বাড়তি সোনা রূপা এবং আমদানিরও অনেক অংশ ভারতে থাকিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেটা দেখি, কাহারও গণনার মধ্যেই যেন আসে না—সকলেই সে কথাটাকে যে কোন উপায়ে হোক চাপা দিয়া রাখেন—কেহই যেন তাহা কাণে তুলিতে চান না। কিন্তু এই প্রকার চাপা দেওয়া গণনার ফলে আমরা তো প্রত্যক্ষ করি যে, দিন দিন ভারতে অশান্তি কিরকম বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অশান্তি বৃদ্ধির ফল হয় তো আজ খুব স্পষ্ট আকারে দেখা দিবে না, কিন্তু কিছু পরে দেখা না দিয়া যাইতে পারে না। মানুষের স্বাধীনতালাভের আকাংক্ষা যে আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু ইহা আমরা খুবই দৃঢ়তা সহকারে বলিব যে, অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা থাকিলে কোন দেশেই, বিশেষত ভারতবর্ষের মত একটা সুপ্রসিদ্ধ রাজভক্ত মহাদেশে বৈপ্লবিক ভাব সহজে মাথা তুলিতে চাহিবে না। বৈপ্লবিক ভাব জাগিয়া উঠিলে ধর্ম্মভাবের পরিণতিলাভে বিলম্ব ঘটে। এই কারণে আমরা গবর্ণমেণ্ট ও দেশ উভয়েরই হিতৈষণা-প্রণোদিত হইয়াই গবর্ণমেণ্টকে ধীরভাবে দূরদৃষ্টির সঙ্গে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি যে, নূতন সেটেলমেণ্টে কর বৃদ্ধি কতদূর বা কতটুকু সঙ্গত।

উত্তরমেরু শীতল নহে—ভিলহা জলমুর ষ্টিফেনসন নামক একজন কানাডার ভ্রমণকারী সম্প্রতি উত্তরমেরু সম্বন্ধে অনেক অভিনব কথা বলিয়াছেন। তাহা সাধারণের ধারণার একেবারে বিপরীত। তিনি বলেন, "আইসল্যাণ্ডকে নামেমাত্রই তুষারদেশ বলা হয়। সেই দেশের জানুয়ারী মাসের গড় উত্তাপের পরিমাণ ইটালী দেশের মিলান সহরের উত্তাপ অপেক্ষা এক ডিগ্রী মাত্র কম। আমি যখন প্রথম মেরুপ্রদেশে গমন করি, তখন মেরুবৃত্তের একশত মাইলের মধ্যে উত্তাপের পরিমাণ ৮০ ডিগ্রীর উপর লক্ষ্য করিয়াছি এবং দেখিলাম, এস্কিমো জাতির লোকেরা নদীর ধারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের অবিরাম ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। তাহারা রুমাল নাড়িয়া মশামাছি তাড়াইতেছিল। উত্তর মেরুতে তুষারপাত অতিশয় অল্প পরিমাণ। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তর দিকের দ্বীপের উত্তর প্রান্তে ১২০ রকমের ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। এস্কিমো জাতির লোকদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই বরফের ঘর দেখিয়াছে। একজন আমেরিকাবাসী এক এস্কিমো বালককে বলিয়াছিলেন যদি সে এক চামচে তেল খায় তবে তাহাকে তিনি একটী ডলার পুরস্কার দিবেন। ঐ বালকটী পুরস্কারের লোভে এক চামচে তেল খাইয়াছিল। এই একটী মাত্র এস্কিমোকে আমি তেল খাইতে দেখিয়াছি" (সঞ্জীবনী, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)। আমাদের শাস্ত্রে এবিষয়ে যে সকল উক্তি আছে, সেগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলে খুবই মূল্যবান হইবে।

জাগরণ—সেদিন একটী সাধু সুন্দর একটী শ্লোক বলিয়া গেলেন—নিম্নে দিলাম—

পয়লে পহরে সবকোই জাগে, দুসরে পহরে ভোগী।
তিসরে পহরে তস্কর জাগে, চৌথে পহরে যোগী॥

রাত্রির প্রথম প্রহরে সকলেই তো জাগিয়া থাকে, ইহাতে বাহাদুরী কিছুই নাই। দ্বিতীয় প্রহরে ভোগী জাগিয়া থাকে অর্থাৎ আমোদপ্রিয় লোকেরাই দ্বিতীয় প্রহরে রাত্রি জাগরণ করিয়া সময় নষ্ট করে। তৃতীয় প্রহরে চোরেরা জাগিয়া থাকে—যে সময়ে মানুষ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইতে চলিয়াছে, সেই সময়ই চোর তস্কর প্রভৃতির প্রশস্ত সময়। চতুর্থ প্রহরে অর্থাৎ প্রত্যুষ ৩৪ ঘটিকার সময় যোগী জাগ্রত থাকেন। চতুর্থ প্রহরে গাত্রোত্থান করিয়া হাত মুখ ধুইয়া ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলে শরীর যে কিরূপ স্ফূর্ত্তিষ্ঠ হয়, মন কিরূপ তেজস্বী হয়, তাহা যিনি করিয়াছেন তাঁহাকে তাহার পরিচয় দিতে হইবে না; এবং যিনি তাহা করেন নাই তাঁহাকে উহার ফলের শত পরিচয় দিলেও তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

এই সূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটী সুন্দর গান উদ্ধৃত করিতেছি:—

রাগিণী কেদারা—চৌতাল।

যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে।
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান
প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে।
ধন্য সাধু সুখী সেই যে আপন মন-আসনে
রাখিতে তাঁরে পারে।
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পাপত্যাগ ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া
যাঁর তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম॥

ভগবদ্গীতা বলিতেছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

সকল প্রাণীগণের পক্ষে যাহা রাত্রি, সেই সময়েই [বা অবস্থাতেই] সংযমী পুরুষ জাগিয়া থাকেন; যে সময়ে বা অবস্থাতে প্রাণীসকল জাগিয়া থাকে, অন্তর্দর্শী মৌনব্রতী মুনির পক্ষে তাহা রাত্রিস্বরূপ।

কি সুন্দর কথা—ইহার অর্থে প্রাকৃতিক দিবারাত্রির কথাও ধরা যাইতে পারে, এবং আধ্যাত্মিক নিদ্রা ও জাগরণের অবস্থাও ধরা যাইতে পারে।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে প্রত্যূষে উঠিয়া ভগবানে আত্মসমাধানের সার্থকতা বা efficacy প্রতি পদে সমর্থিত দেখা যায়। সুতরাং যোগসাধনে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে ইহা অবহেলার বিষয় নহে।

—

পাত্রকাপরিচয়।

হিন্দু—২৯শে আষাঢ় ১৩৩৬—"কর্ম্মযোগ বা সংস্কার" প্রবন্ধ আর একটু পরিষ্কার করিয়া লিখিলে বুঝিবার সুবিধা হইত। তারপর, প্রবন্ধটী একরাশ ইংরেজী quotation-এর ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর মুখপত্র "হিন্দু" কাগজে শ্রীদানীশ রায়ের "ক্ষুধার শান্তি"র ন্যায় গল্প উদ্ধৃত করিয়া ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে বৃথা সংশয় আনিবার কোন সার্থকতা দেখি না।

বঙ্গবাণী—২৯শে আষাঢ় ১৩৩৬—অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্যের "সংরক্ষণ বনাম সংস্কার" নিবন্ধের ষষ্ঠ কিস্তি চলিতেছে। বড় সুন্দর ভাষা এবং সার কথায় পূর্ণ। এই প্রবন্ধগুলি আশাকরি বটুক বাবু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবেন। চারিদিক হইতে দেশাচার প্রভৃতির বন্ধনপাশ হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার সুবাতাস বহিতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে সুখী, কারণ আদিব্রাহ্মসমাজ জন্ম অবধি আজ শতবর্ষ ধরিয়া এই ভাবেই সংস্কার সমর্থন করিয়া আসিতেছেন।

রাষ্ট্রবাণী—১৬ই আষাঢ় ১৩৩৬—"শিক্ষিতের ব্যর্থতা কোথায়?" সম্পাদক সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা বলি, চাকরি জুটাইবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট শিক্ষাদানেই উহার ব্যর্থতা। আমাদের পূর্ব্বতন শিক্ষায়:ছাত্রের পারদর্শিতার সাক্ষ্য দিতেন স্বয়ং গুরু; আমাদের মনে হয় তাহা খুব ভাল। "খোলা চিঠি"তে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ অনেকগুলি সত্যকথা বলিয়াছেন। চরকাই (এবং কাপড়ের কল নহে) যে আমাদের বাঁচিবার একমাত্র না হউক, অন্তত অন্যতর প্রধান উপায়, ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের মত সকলেই তাহা উপলব্ধি করিবেন। নাগ মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন—"চরকা সম্বন্ধে প্রতিযোগিতার কোন কথাই উত্থাপিত হইতে পারে না। বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আপন ব্যবহারের বস্ত্রের জন্য চরকায় সুতা কাটাতে প্রতিযোগীতার প্রশ্নই অসংলগ্ন। পরন্ত চরকার সেবা লোককে দুষ্কার্য্য হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম"। পরাধীন জাতির পক্ষে যে কোন কল হউক, সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্ত করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন নিঃসন্দেহ।

পণ্ডীচেরীর শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের আশ্রমবাসী শ্রীঅনিল বরণ রায় নিশ্চয়ই মদ্যপানের পক্ষপাতী নন। কিন্তু তিনি এদেশবাসী দরিদ্রদিগের মদ্যপান সমর্থন কি প্রকারে করিলেন, আমরা তাহা বুঝিলাম না। এবং তজ্জন্য আমরা মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"বাস্তবিক আমাদের দেশের জনসাধারণ যেরূপ গভীর দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে পশুর অধম জীবন যাপন করে, তাহাতে তাহাদের জীবনের একমাত্র সুখ ও সান্ত্বনা মদ্যপান। সেইটুকু ছাড়িলে তাহারা বাঁচিবে কি লইয়া"? তবে তাঁহার মতে পশুর অধমত্ব দূর করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় কি মদ্যপান? সান্ত্বনালাভের যে উপায় বলিয়াছেন, উহা আশ্রমবাসী অনিল বাবুর উপযুক্ত নহে, মদ্যব্যবসায়ী বিলাতী বণিকের উপযুক্ত। আর আশ্রমে বসিয়া যদি তাঁহার ঐ শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে, তবে আশ্রমধারী অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় যত শীঘ্র আশ্রম উঠাইয়া দেন ততই দেশের মঙ্গল। আমারও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া নাগ মহাশয়ের সহিত একপ্রাণে একহৃদয়ে বলিব যে "মদ্যপান পরিহার না করিলে দেশের মুক্তি অসম্ভব"। এ বিষয়ে শীঘ্রই আমরা একটী প্রবন্ধে আমাদের মতামত বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করিব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেছি যে, একাধিক পত্রে পাত্রিকার মত ও প্রবন্ধাদি উদ্ধৃত হইতেছে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পত্রিকা ভগবন্নির্দ্দিষ্ট পথে নির্ভয়ে চলিতেছে এবং তাহার ফলে ভগবৎনিহিত-প্রাণ জনসাধারণের সাদর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

গত আষাঢ়-সংখ্যা দেখিয়া বাঁশবেড়িয়ার রাজবংশের সুযোগ্য বংশধর কুমার শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় বলেন যে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এরূপ উচ্চাঙ্গের পত্রিকারূপে পরিচালিত হইতেছে তাহা জানিতাম না"।

গত শ্রাবণ-সংখ্যা সম্বন্ধে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ সেবক ও কর্ণধার এবং "ব্রহ্মবাদী" পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত মনমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন—"তত্ত্ববোধিনীতে আষাঢ়ের বিভিন্ন প্রকারের বহু লেখা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করি। আপনার অঞ্জলি পাঠ করিয়া বেশ লাগে। শ্রাবণ সংখ্যায় শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত প্রবন্ধ পড়িয়া ব্যথার সঙ্গে সঙ্গেও আশা ও আনন্দ হইল—এমন তাজা কথা লেখার লোক আছেন।"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬—"বৈষ্ণবধর্ম্ম-নীতিবাদ" প্রবন্ধে শ্রীরত্নেশ্বর সেন যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে—সকল বিষয়ে একমত নাই বা হইলাম। ইহাতে "জীবের জ্ঞানদান কর্ত্তব্য", "দুঃখীকে কৃপা কর্ত্তব্য" প্রভৃতি নীতিকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিক হইতে সমর্থন করিয়াছেন। কয়েক স্থলে যুক্তির সমস্তটা মানিতে না পারিলেও প্রবন্ধটী পড়িয়া সুখী হইলাম—অনেকাংশে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর বহির্ভূত।

বিচিত্রা—আষাঢ় ১৩৩৬—আরম্ভেই বুদ্ধদেবের একটী সুন্দর ধ্যানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহা তুরফানের কোন বিহারের প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত। দেখিয়া হিন্দু জাতির পূর্ব্ব মহিমা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র হইতে একটী অংশ "বেদনার মূল্য" নাম দিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে—অংশটুকু বড় সুন্দর। আমরাও আবার সেই অংশ হইতে নিম্নোক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। "ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আমাদের হাতে নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, যথার্থ বড় দুঃখ আপন মহত্ত্বের দ্বারাই বেদনার মধ্যেই গভীর ভাবে আপন মুক্তি আপনি সংগ্রহ করে"। "ক্ষর ও অক্ষর" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বৈতবাদের মূল কথা সংক্ষেপে সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। "কর্ত্তব্যের কথা" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক বড়ই কঠিন বিষয় আনিয়াছেন। তাঁহার উপসংহারে বলিয়াছেন—"আমাদের গোড়াতে মেনে নিতেই হবে যে, প্রত্যেক মানুষের বিবেক একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব অনুভব নয়—তা একটা নিত্য সাধারণ

জ্ঞান"। ইহার সূত্রটী কি, তদ্বিষয়ে পরে আলোচনা করিবেন—আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম। কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ সূত্রে মৌখিক ধন্যবাদ দেওয়া না দেওয়ার অবতারণার সঙ্গতি ঠিক বুঝিলাম না। গুরুতর দার্শনিক বিষয় বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় সুলিখিত। "মধ্য এসিয়ায় হিন্দু সাহিত্য" প্রবন্ধ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী চিত্রসহ প্রকাশ করিয়া বড়ই সুখপাঠ্য করিয়াছেন। সার অরেল ষ্টীনের অবলম্বনেই প্রবন্ধটী লিখিত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, স্বেন হেডিনকে অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধের পরবর্ত্তী কিস্তি অলঙ্কৃত করিলে ভাল হয়।

—

গার্হস্থ্যসংবাদ।

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন।—গত ২৯শে ভাদ্র রবিবার ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীমান হৃদীন্দ্রনাথের শিশুপুত্রের নামকরণ ও 'অন্নপ্রাশন'-সংস্কার আদি-ব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে ৬, দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনস্থ পারিবারিক উপাসনামণ্ডপে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর নাম শ্রীমান হৈমেন্দ্রনাথ হইয়াছে। ভগবান ইহাকে সাধুগুণে বিভূষিত করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ।—গত ১১ই ভাদ্র বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥০ ঘটিকায় ৺দিবনাথ শাস্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পত্নী শ্রীপ্রভা দেবী কর্ত্তৃক বালিগঞ্জে ২১ নং ষ্টেশন রোডে স্বকীয় বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ষোড়শদ্রব্য সহ ভোজ্যাদি উৎসর্গের পর পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি শ্রাদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছেন।

—

শোকসংবাদ।

৺অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।—'সাধক রাম-প্রসাদ' 'কমলাকান্ত' 'নচিকেতা' প্রভৃতি পুণ্যজীবনীর গ্রন্থকার, পত্রিকার অন্যতর পুরাতন লেখক এবং আমাদের প্রিয় সুহৃদ সুসাহিত্যিক অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ৩১শে চৈত্র শনিবার রাত্রিতে হৃদরোগে তাঁহার রাঁচিস্থ প্রবাসভবনে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভারতীর যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। মৃত্যুকালে ইহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ৫০ বৎসর হইয়াছিল। ইহার এই আকস্মিক অকাল-মৃত্যুতে শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাদের গভীর শোকে সান্ত্বনা বিধান করুন।

৺দিবনাথ শাস্ত্রী—আদিব্রাহ্মসমাজের ভূত-পূর্ব্ব আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ৺প্রিয়-নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান দিবনাথ গত ২রা ভাদ্র রবিবার সুদূর কনখলের পুণ্যভূমিতে তাঁহার দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়ঃ-ক্রম মাত্র ২৬ বৎসর হইয়াছিল। ইহার এই অকাল মৃত্যুতে শোকার্ত্ত পত্নী ও পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহঁাদের প্রগাঢ় শোকে সান্ত্বনাবিধান পূর্ব্বক লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় দান করুন।

—

সংবাদ।

ভাদ্রোৎসব।—এবার শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে আদিব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ও স্থানান্তরে ভাদ্রোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গত ৫ই ভাদ্র বুধবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ কয়েকজন শ্রদ্ধাবান উপাসক সর্ব্বপ্রথম খোল-করতাল সহযোগে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করেন। তারপর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী-গ্রহণপূর্ব্বক উদ্বোধন ও উপাসনান্তর যথারীতি উপদেশ প্রদান করেন। উপ-দেশের বিষয় ছিল "ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ"। মুদ্রিত উপদেশ সভায় বিতরিত হইয়াছিল। পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরাও উহা প্রকাশ করিলাম। নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করিলে ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি লইয়া ভাদ্রোৎসব ও মাঘোৎসবের মধ্যে উত্থিত বিবাদের নিগূঢ় নির্ণয় লাভ করিয়া পাঠক আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথারীতি সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-শেষে পুনর্ব্বার একটী কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। আদ্যন্তে খোল-করতাল সহযোগে কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তনায় সমস্ত উপাসনাটীর উপর একটী অভিনব দিব্য-শ্রীর সঞ্চার হইয়াছিল।

গত ৮ই ভাদ্র শনিবার প্রাতে ৭ ঘটিকায় সিটি-কলেজের ত্রিতল-সভাগৃহে ব্রাহ্মসমাজের শাখাত্রয়ের একটী সম্মিলিত উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কৃষ্ণকুমার বাবুর উদ্বোধন, কামাখ্যা বাবুর আরাধনা ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের উপদেশ—সবই সুন্দর হইয়াছিল। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর উপদেশের বিষয় ছিল "নিরাশার স্থান নাই"। ইহা মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। মানুষ যখন জীবনের পথে চলিতে চলিতে সম্মুখের সাময়িক দুঃখ-দুর্গতির বিভীষিকায় হতাশ হইয়া পড়ে, তখন দুর্দ্দিনে যে তাহার সহায় হয়—অন্ধকারে যে আলো প্রদর্শন করে, তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার এই উপদেশে আমাদের সমাজে ঘোর হতাশার মধ্যে বিশুভ্র আশাভরসার প্রতি আমাদের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া-ছেন, আমাদের সাময়িক ভয়-ভাবনার অন্ধকারে উৎ-সাহ ও উদ্দীপনার আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন। তাই এ উপদেশটী সমবেত উপাসকগণের সানন্দ অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল। দেখিয়া সুখী হইলাম তত্ত্বকৌমুদীর বর্ত্তমান সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত

উপাসনার সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীকুমুদিনী বসু এবং তাঁহার সহোদরা শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী এবং স্বনামধন্য ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী।

গত ৯ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় "ভবানীপুর সম্মিলনসমাজে" ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক "ব্রাহ্মসমাজের দান" বিষয়ে একটী গভীরার্থদ্যোতক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীবাণী দেবী। সঙ্গীত ও উপদেশ মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরাও উপদেশটী প্রকাশ করিলাম। সম্মিলনী সমাজের সুবৃহৎ উপাসনাগৃহটী সমাগত উপাসকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উপাসনান্তে সকলেরই হৃদয় প্রগাঢ় প্রীতি ও তৃপ্তির সুমধুর রসে আনন্দিত ও প্রফুল্লিত হইয়াছিল। আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এবারে ভাদ্রোৎসবের যে ক্ষুদ্র আয়োজন হইয়াছিল, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহা সফলতা লাভ করিল। শ্রীসু. চ. চৌ।

দান।

মহামান্য 'পীথাপুরম্'-রাজ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মাননীয় যুবরাজ-মহোদয়ের শুভ বিবাহোপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজে ৬০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-সহকারে আমরা উহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। ভগবান নবদম্পতীকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

ভ্রম-সংশোধন।

গত শ্রাবণ-সংখ্যা পত্রিকায় "ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে ১১৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের একবিংশ পংক্তির সর্ব্বশেষ শব্দ "৺শিবচন্দ্র"র পরিবর্ত্তে "৺চন্দ্রশেখর" হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা
১০৩৪

১৮৫১ শক
আশ্বিন

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১৪ অঞ্জলি—নেতা দেবতা।

১। তুমি আমাদিগের নেতা। তোমার প্রসন্ন মুখে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হও এবং আমাদের কাম্য বস্তুসকল বিধান কর। আমাদের কাতর প্রাণের আহ্বান তুমি শ্রবণ কর। কি ভাবে ডাকিলে তুমি আমাদের নিকট ধরা দিবে, তাহা তুমিই আমাদিগকে শিক্ষা দাও। তুমিই আমাদের দুঃখ ও অশান্তি দূর করিয়া সুখশান্তি বিধান কর।

২। হে মঙ্গল্য সর্ব্বব্যাপী বিভু! তুমিই আমাদের নেতা। আমরা তোমাকে ব্যাকুল অন্তরে ডাকিতেছি। তুমি আমাদের বিপদ আপদ বাধা বিঘ্ন সকলই দূর করিয়া দাও। তুমি আমাদিগকে বলবীর্য্য প্রদান কর, প্রচুর ধনধান্য প্রদান কর, প্রভূত সুদৃশ্য বলবান ও বেগবান গো অশ্ব প্রদান কর, যাহাতে আমরা সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিতে পারি।

৩। আমাদের সম্মুখে তোমার সৌম্যমূর্ত্তি প্রকাশ কর। আমরা যেন তোমার প্রদর্শিত শ্রেয়ের পথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত না হই। তুমি আমাদের পুত্রপৌত্রাদিকে বংশপরম্পরায় দীর্ঘায়ু কর এবং জ্ঞানে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমুন্নত কর।

৪। আমাদের শত্রুগণ ধনগর্ব্বে ও বলগর্ব্বে মত্ত হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশসাধনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট রহিয়াছে। তুমি আমাদিগকে শক্তি ও বল দাও, যাহাতে আমরা তাহাদের বীর্য্য ও তেজ হরণ করিয়া তাহাদের চেষ্টাসকল ব্যর্থ করিতে পারি। তাহারা আমাদের প্রজাগণের ভিতর বিরোধবিবাদের অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তোমার প্রেমবারির সাহায্যে সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার শক্তি প্রদান কর।

৫। অগণিত গ্রহনক্ষত্রখচিত এই বিশ্বজগত তুমি সেতুস্বরূপ হইয়া ধারণ করিয়া আছ। তোমারই আদেশে কোটী কোটী রবিশশী অন্তরীক্ষের পথে ভ্রাম্যমাণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে উন্নতির পথে লইয়া চলিতেছে। তোমারই সুনিয়মে শতসহস্র নদনদী সুনির্ম্মল বারিধারা বহন করিয়া জীবগণের প্রাণধারণের উপায় বিধান করিতেছে। তোমরই আদেশে জল ঔষধে পরিণত হইয়া আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু হইতে মুক্তি প্রদান করে।

৬। মানবের অন্তরে তুমি জ্ঞানের যে অগ্নি-

কণা নিহিত করিয়া দিয়াছ, তাহারই সাহায্যে জগতের মহা হিতসাধক অগ্নিকে মানব আবিষ্কার করিল। সেই অগ্নির সাহায্যে মানুষ ভূধর সাগর সর্ব্বত্র স্বীয় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিল এবং চতুর্দ্দিকে কর্ম্মযজ্ঞের ক্ষেত্র উন্মুক্ত ও প্রসারিত করিল।

৭। হে ভক্তবৎসল! আমাদের সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি তোমারই প্রতি অর্পিত হউক। আমাদের যত কিছু প্রাণের আশাভরসার কথা সে সমস্তই তোমার কর্ণে প্রবেশ করুক। তুমি আমাদের প্রতি দয়া কর—আমরা তোমাকেই জীবনের প্রভু পাইয়া সবল পদে দাঁড়াইতে পারিয়াছি। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমরা অনাথ। হে অনাথের নাথ! আমাদিগকে তোমার স্নেহপ্রেমে ঘিরিয়া রাখ। আমরা কাতর প্রাণে তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি—তুমি আমাদের দৈন্য দারিদ্র্য দূর করিয়া দাও এবং আমাদের কাম্য বস্তু বিধান কর। দুঃখ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া আর কত কাল চলিব? আমাদিগকে সুখশান্তি প্রদান কর। আমাদিগকে সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে মুক্তি প্রদান কর। আমাদের গৃহ হইতে রোগ শোক দূরে সরাইয়া দাও। আমাদিগকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া তোল।

৮। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা তিলমাত্র বিচলিত না হয়। তোমার চরণসেবার ব্রত হইতে যেন আমরা পরিভ্রষ্ট না হই। তুমি আমাদিগকে পাপতাপ হইতে রক্ষা কর এবং দুঃখবিনাশন শুভসম্পদে পরিবৃত কর।

৯। সকল দেবতার তুমিই পরম দেবতা। তুমিই কেবল বরণীয়। তোমার সমান দ্বিতীয় কেহ নাই। তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তুমি অপ্রতিম পরমাত্মা। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি।

১০। যে তোমার চরণ ধরিয়া থাকে, তুমিই তাহার যোগক্ষেম বহন কর। যে তোমার শরণ লয়, তুমি সেই শরণাগতকে প্রভূত সুখৈশ্বর্য্য প্রদান কর।

১১। আমরা তোমাকে একমনে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের কাতর আহ্বান শুনিয়া আমাদের হৃদয়ে আসিয়া চিরবসতি কর।

১২। আমাদের গৃহে গো অশ্ব প্রভৃতি জীবজন্তুসকল সুখে বর্দ্ধিত হউক। আমাদের ভূমি লক্ষ্মীপ্রসবিনী হৌক। আমাদের গাভীসকল সুমিষ্ট দুগ্ধ প্রদান করুক। আমাদিগকে ধনরত্ন প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর। আমাদের কর্ম্ম সকল সুফলপ্রসূ কর। আমাদের জীবনযাত্রায় তোমার নাম লইয়া আমরা যেন সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করি। তুমি এই আশীর্ব্বাদ প্রদান কর—তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

—

ব্রহ্মোপাসনা ও স্বাধীনতা।

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

আজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা সেই অমৃত পুরুষের নাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবার জন্য এই পবিত্র স্থানে সমাগত হইয়াছি। তোমরা সকলে আমার সঙ্গে একপ্রাণ একহৃদয় হইয়া আত্মার অন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর এবং অপরূপ অরূপ জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় ও আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে সমাসীন সেই অমৃতস্বরূপ পরমপুরুষের সন্দর্শন লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য কর। আমাদের সাংসারিক প্রয়োজন সাধনের জন্য যেমন সেই মহা ঐশ্বর্য্যবান মহেশ্বর আমাদের চারিদিকেই নানাবিধ অর্থ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন—সংগ্রহ করিবার কৌশল শিক্ষা করিলেই তাহা সংগ্রহ করিতে পারি; সেইরূপ আমাদের আত্মার উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের জন্য সেই অমৃতপুরুষ তাঁহার অক্ষয় অমৃত ভাণ্ডারের সকল দুয়ারই আমাদের সম্মুখে নিত্যই উন্মুক্ত রাখিয়াছেন; সংগ্রহ করিবার কৌশল প্রয়োগ করিতে পারিলেই আমরা সেই অমৃতভাণ্ডার হইতে অমৃত সংগ্রহ করিয়া মনপ্রাণ পরিতৃপ্ত করিতে পারি এবং অমৃত পান করিয়া অমরণধর্ম্মা হইতে পারি।

আজ এই মঙ্গলপ্রভাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে অমৃত সংগ্রহের সেই কৌশল শিক্ষা কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সহজ সত্য ও কল্যাণজনক উপদেশ গ্রহণ কর যে, সেই নিরবয়ব নিরঞ্জন নিরাকার পরমেশ্বরকে সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন করিয়া দিয়া এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত হইয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রাণমন ঢালিয়া দাও। ইহাই অমৃতসংগ্রহের একমাত্র কৌশল। তাঁহার উপাসনাতে একনিষ্ঠভাবে ব্রতী হইলে হৃদয় সহজেই প্রশস্ত হইবে, আত্মা স্বতই উন্নত হইবে—অমৃত লাভ করিয়া অমর

হইবে। প্রত্যক্ষ কর, সেই বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর প্রকৃতিতে যে-সকল মঙ্গলনিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন; সে সমস্তেরই গতি উন্নতিরই অভিমুখে। সেই সমস্ত নিয়মের গতি উন্নতির অভিমুখে বলিয়াই জগতে উন্নত মানবজন্ম সম্ভব হইয়াছে; এবং যে মানব আদিম অবস্থায় বন্য পশুর ন্যায় অরণ্যে বিচরণ করিত এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পরস্পরকে হিংসা করিয়া, পরস্পরের বধসাধন করিয়া মাংস খাইবার মাত্র স্পর্দ্ধা করিত, আজ সেই মানব ব্রহ্মনামের বিজয়পতাকা স্কন্ধে বহন করিয়া চারিদিকে তাঁহারই বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে সমুদ্যত; আজ সেই মানব অমরণধর্ম্মা দেবতাদের সঙ্গে একাসনে সমাসীন হইয়া ভগবানের বিজয়গাথা গাহিবার স্পর্দ্ধা করে।

ভগবানের উপাসনায় মনপ্রাণ সত্যাসত্য উৎসর্গ করিলে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হইলে কিরূপ তড়িৎবেগে জাগরণ আসিয়া আমাদের চক্ষু হইতে নিদ্রা ও আলস্যের জড়তা হরণ করে, উন্নতির প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে কিরূপ বলের সহিত আকর্ষণ করে, ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব—ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বকালীন এবং তাহার উত্তরকালীন, এই উভয়কালীন অবস্থা তুলনা করিলেই তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা ভারতের সর্ব্বাঙ্গ কিরূপ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিরই তাহা অবিদিত নাই। অযথা পৌরোহিত্য, অযথা গুরুবাদ প্রভৃতির পরাধীনতা ভারতবাসীর মনপ্রাণের উপর কি প্রকার গুরুতর পাষাণভার চাপাইয়া রাখিয়াছিল; এই পরাধীনতা পবিত্র গার্হস্থ্য বন্ধনেরও উপর সবল আঘাত করিয়া তাহা কিরূপ শিথিল করিবার উপক্রম করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার অতি সামান্যমাত্র বিবরণ ও নিদর্শন দেখিতে পাই। বর্ত্তমানেও তাহার ধ্বংসাবশিষ্টমাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ শতাব্দীর ব্যবধানে তদানীন্তন সামাজিক পরাধীনতাজনিত দারিদ্র্য ও সঙ্কীর্ণতা আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারি কি না সন্দেহ।

পরাধীনতার কঠোর নিগড়ে বহুকাল যাবৎ আবদ্ধ থাকিবার ফলে ভারতবাসীর প্রাণ শুষ্ক ও অসাড় হইয়া গিয়াছিল; নিজের কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, তাহা বিচার করিবার শক্তিই ভারতবাসী ক্রমশই হারাইয়া ফেলিতেছিল। যেই কেহ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিল, স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ অকর্ত্তব্য, অমনি জনসাধারণ তাহার প্রকৃত মূল্য বিচার না করিয়াই যন্ত্রচালিত পুতুলের মত তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। যেই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী কেহ শাস্ত্রের নাম লইয়া বলিল যে, লেখাপড়া শিক্ষা করিলে স্ত্রীলোক নরকে গমন করে বা বিধবা হয়, অমনি জনসাধারণ নির্ব্বিচারে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইল। এই প্রকার অযথা শাস্ত্রবাদ, অযথা গুরুবাদ প্রভৃতির চরণে হৃদয়ের স্বাধীনতা বিসর্জ্জনের ফলে জনসমাজের, কি পুরুষ কি স্ত্রীজাতি, উভয় অংশ হইতেই জ্ঞানজ্যোতি অপসৃত হইতে লাগিল এবং অজ্ঞানের বিপুল ঘনচ্ছায়া স্বীয় অন্ধকার আবরণে জনসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। এইরূপে ভারতবাসী চিন্তাশক্তি হারাইল, বিচারশক্তি হারাইল। পরাধীনতার পদে ভারতবাসী এইরূপে আত্মবলি দিবার ফলে এবং তদনুষঙ্গী অজ্ঞানের অন্ধকূপে আপনাকে নিমগ্ন রাখিবার ফলেই এদেশে কাপালিক প্রভৃতি বামাচারী কদাচারী নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। চিন্তাশক্তি বিচারশক্তি হারাইয়া ভারতবাসী নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ভাবনাও অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিল। সে আপাতসুখকেই বেশী করিয়া দেখিতে লাগিল—ভবিষ্যতের অমঙ্গল বা অবনতির সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে চাহিল না। তাহার ফলে বালিকার আট বৎসর বয়সে, এমন কি, জন্মগ্রহণের পরেই বিবাহের প্রথাও প্রচলিত হইল। শিক্ষার অভাবে এবং শিক্ষাদানের অভাবে বালিকা-হত্যা, নদীতে প্রথম পুত্র ভাসাইয়া দেওয়া, সহমরণ প্রভৃতি অমানুষিক কুপ্রথা সকল ভারতের উর্ব্বর ভূমি ভেদ করিয়া গভীর স্তরে শিকড় নামাইতে পরিয়াছিল এবং সমাজদেহকে শতধা ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছিল। পরাধীনতা ও অজ্ঞানের কারণেই ছুঁৎমার্গ ক্ষয়রোগের মত আমাদের দেশকে জীর্ণ শীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। এই ছুঁৎমার্গের প্রভাবে আজ পর্য্যন্ত মানুষ মানুষকে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও অস্পৃশ্যবোধে ঘৃণা করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মই এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়া ভারতবাসীর এই সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা ও তদনুষঙ্গী অজ্ঞানের মূলে কঠোর অস্ত্রাঘাত করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার এই মূল সূত্র স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেই হৃদয়ে নিহিত আছে। সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন পাই।" এইরূপ স্পষ্টভাষায় মানবাত্মার স্বাধীনতার মুক্তিবাণী বিঘোষিত হইবার ফলে, ভারতবাসী স্বাধীনতার মুক্ত বসন্তবায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্য লাভের পথে, মুক্তির

পথে অগ্রসর হইবার অবসর লাভ করিল। ভারতবাসী বুঝিল যে, ভগবানের ক্রোড়ে যাইবার পথ প্রত্যেক মানবের নিকট উন্মুক্ত। ভারতবাসী বুঝিল যে, ভগবানকে পাইবার জন্য এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে সহায়তার জন্য যে কেহ যে কোন বিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টা করিবে, মানুষের সে পথে অর্গলরূপে দাঁড়াইবার কোন অধিকার নাই। ভারতবাসী নিজে বুঝিল এবং জগৎবাসীকে বুঝাইল যে, ভগবানকে সমুদয় হৃদয়ের সঙ্গে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ উপাসনাই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়—সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল লাভের অনন্য সোপান।

শুধু মুখে নহে, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনার ফল বটে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতালাভ এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলসাধন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইও না। উপলব্ধি কর—তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের মাতা। উপলব্ধি কর—তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নাড়ীতে-নাড়ীতে যোগ নিবদ্ধ আছে। পিতামাতাকে নিকটে পাইলে কুলপাবন সৎপুত্র যেমন আর সমস্তই তুচ্ছ বোধ করে, উপেক্ষাদৃষ্টিতে দেখে, ভগবানকেও সেইরূপ পিতামাতা এবং নিত্য সহচর বলিয়া উপলব্ধি করিলে সংসারের আর সমস্তই তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ হইবে—দুঃখকষ্টকে দুঃখকষ্ট বলিয়াই মনে হইবে না। তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া উপলব্ধি করিলে হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করা কিছু কঠিন কার্য্য হইবে না—শ্রদ্ধাভক্তি স্বতই তাঁহার চরণে সমুত্থিত হইবে। তখন তাঁহার প্রেম, তাঁহার মঙ্গলভাব জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে, প্রকৃতির সর্ব্বত্র অঙ্কিত দেখিব; দেখিব, তাঁহার স্নেহ করুণা ভূলোক দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়া আছে। আজ এই মঙ্গলপ্রভাতে তাঁহার অজেয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ভীকহৃদয়ে সংসারের সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিজয়ী হও।

আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রমালা, পূর্ণ শশধর; ধরণীপৃষ্ঠে শ্যামল বনরাজি, পর্ব্বতমালা, কলনিনাদিনী তটিনী, নৈশ মলয়বায়ু, এসমস্তই মানবের অন্তরে কত না অনুপম আনন্দধারা প্রবাহিত করে। এই আনন্দধারা তাঁহাকে রসস্বরূপ বলিয়াই সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে। সংসারে দুঃখকষ্টের যে আঘাত আমরা সময়ে সময়ে লাভ করি, তাহাও তাঁহাকে সকল অভাবের মোচয়িতা, সকল কষ্টের শান্তিরূপে প্রকাশ করিতেছে। সেই অমৃত পুরুষ প্রেমময়, স্নেহময় বলিয়াই তাঁহার প্রতিনিধি পিতামাতার হৃদয়ে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্নেহ-প্রেমের কত না উৎস খুলিয়া যায়।

আজ এই পবিত্র সময়ে সেই পরম করুণাময় পরম পিতামাতার চরণে সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন করিয়া দাও, তোমার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত থাক, দুঃখকষ্ট বিপদ আপদ তোমার নিকটে আসিতে সাহস করিবে না। দুঃখের যদি বা কঠিন আঘাত পাইয়া থাক, বিপদের কশাঘাতে যদি বা বড়ই ব্যথিত হইয়া থাক, তথাপি জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিও না, বলহীনের ন্যায় কেবলই হাহুতাশ করিও না। নিশ্চয় জানিও যাঁহার ইচ্ছাতে এই জগতসংসার নিশ্বসিত হইয়াছে; যাঁহার ইচ্ছাতে তুমি এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাঁহার সঙ্গে তোমার এক নিমেষেরও বিচ্ছেদ নাই। তিনি তোমার চিরসঙ্গী, চিরসখা ও চিরসুহৃৎ। তিনিই তোমার বিপদভঞ্জন ও অভয়দাতা। তাঁহাকে অন্তরের সঙ্গে ডাক, তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহামন্ত্র আমাদের কর্ণে শুনাইতেছেন, সেই মহামন্ত্র তোমরা কৌস্তুভমণির মত হৃদয়ে ধারণ কর; তাহাই অক্ষয় কবচ হইয়া তোমাদিগকে নিশ্চয়ই সমস্ত বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিবে। তোমরা আপনাদিগকে সত্যসত্যই অমৃতের পুত্র বলিয়া উপলব্ধি কর, যথার্থই আপনাদিগকে মৃত্যুর অতীত বলিয়া জান—মৃত্যু তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে সাহস করিবে না।

ব্রাহ্মসমাজে অবসাদ কেন?

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

শ্রীশুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী তরুণ যুবক ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবসাদের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া যে প্রবন্ধ দিয়াছেন, তাহা গতবারের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক নেতাই এই বিষয় লইয়া অল্পবিস্তর আলোচনা করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজকে সংরক্ষণ এবং মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই অমূল্য দানের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে যে কিছু উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন, সম্প্রদায়গত গোঁড়ামি পরিহার করিয়া, তাহার দিকে আমাদের সমগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে; এবং কার্য্যত উহার প্রতীকারকল্পে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ আরও ম্লান হইয়া পড়িবে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যদিও শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের মতামত ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই ইহার প্রভাব সমগ্র জগতে সকল

সম্প্রদায় মধ্যে অল্পবিস্তর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাধীন চিন্তা জাগাইয়া তুলিতেছে, বিশাল হিন্দুসমাজকেও স্পর্শ করিয়া ইহার ভিতরে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে; পুরাণ-তন্ত্রের ভিতরে আপাতদৃষ্টিতে যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহার অন্তরালে যে আধ্যাত্মিক সত্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করিয়া পুরাণ ও তন্ত্রবাদী জনগণকে স্তোক দিবার প্রয়াস চলিতেছে। এই স্বাধীন চিন্তার ফলে এমন কি সুপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ যথেষ্ট সাহসিকতার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, যেসকল আচারপদ্ধতি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে দেখা যায়, তাহার সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন যে, সময়ের ও শিক্ষার পরিবর্ত্তন ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিধিনিষেধকে যদি বর্ত্তমান সময়ের কতকটা উপযোগী করিয়া লওয়া না যায়, সাবেক শাস্ত্রের বাঁধুনিকে যদি শিথিল করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে হিন্দু জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমরা হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ এই দুইটী নামের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া ঘোষণা করেন ও উহাতে গৌরব অনুভব করেন এবং হিন্দুর সর্ব্ববিধ আচার একেবারে পরিহার করিয়া যথেচ্ছভাবে অবস্থান করিতে ভালবাসেন। তাই বর্ত্তমানে সাধারণের চক্ষে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সর্ব্ববিধ সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্ম হওয়া ও খৃষ্টান হওয়া প্রায় এক। একারণে একেশ্বরবাদের উপর প্রগাঢ় আস্থা থাকিলেও অনেকে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে মিশিতে চান না। ইহাতে একেশ্বরবাদপ্রচারের ও ব্রাহ্মসমাজের পরিপুষ্টির বিশেষ বাধা ঘটিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত থাকিয়া আমরা যদি একেশ্বরবাদের বার্ত্তা ঘোষণা করি, তাহা হইলে আমরা যতদূর ফললাভ করিবার আশা রাখিতে পারি, হিন্দুসমাজের সহিত বৈরীভাবে এবং হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক চিহ্নরূপে ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া এবং তাহার নিন্দাবাদ করিয়া আমরা সে ফল আশা করিতে পারি না। বর্ত্তমানে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে শিক্ষিতমণ্ডলীর অধিকাংশই একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী এবং ক্রিয়াবহুল বর্ত্তমান পূজাপদ্ধতির প্রতি অনাস্থাবান। কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মনামে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন সম্বন্ধে অনুকূল মত পোষণ করেন না বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজের দলভুক্ত হইতে চাহেন না। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ও শ্রীবৃদ্ধির পরিপন্থী বলিয়া যাহা আমাদের মনে হয় তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১। ব্রহ্মোপাসনায় উপনিষদমন্ত্রের বিলোপ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মতামতের ভিতরে সার্ব্বজনীন ভাব থাকিলেও তিনি উপনিষদের উপরে ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যানে ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত উপাসনাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উপনিষদ মন্ত্রের উপরে দণ্ডায়মান। উপনিষদের মন্ত্র দেখিলে তৎবিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের বড় কিছু বলিবার থাকে না। হিন্দু সমাজ এই মাত্র আপত্তি করিতে পারেন যে উপনিষদের ভাব বড় উচ্চ, উহা সাধারণ গৃহীর উপযোগী নহে। কিন্তু কালক্রমে অন্যান্য শাখায় সেই বৈদিক মন্ত্রগুলি উপাসনাপদ্ধতি হইতে বিলুপ্ত হইল। ইহারই ফলে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের কতকটা আস্থা হারাইল।

২। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে হিন্দুজাতি ও হিন্দুর বিশেষত্বের অভাব। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বেশভূষা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুর বিশেষত্বের স্থানে পাশ্চাত্য ভাব সমধিক পরিমাণে ফুটিয়া উঠিতেছে। হিন্দুর সে নিষ্ঠা সে ঐকান্তিকতা অন্তর্হিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিবাহাদি ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান যাহা পারিবারিক অনুষ্ঠান বলিয়া চিরদিন পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, আজকাল ঐ সকল ব্যাপার অনেকস্থলে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। আত্মীয় স্বজন ও দরিদ্রনারায়ণের সেবায় হৃদয়ের আন্তরিকতার ও বিশালতার যে পরিচয় মিলিত, তাহার বিলোপ সাধিত হইতেছে। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের সহানুভূতি হারাইতেছেন।

৩। সুশিক্ষিত আদর্শচরিত্র সুপণ্ডিত আচার্য্যের অভাব। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সুবক্তা ও সুপণ্ডিত ছিলেন; অধিকন্তু তাঁহাদের লোক আকর্ষণের যথেষ্ট শক্তি ছিল। হিন্দুশাস্ত্রের উপরে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার ছিল। কিন্তু আজকাল আর সে দিন নাই। আচার্য্য বা উপদেশক যদি অধিকাংশ শ্রোতা অপেক্ষা সুপণ্ডিত বা অধিকতর চরিত্রবান ও বিনয়ী না হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে শূন্যগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতাগণের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করা সুকঠিন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে আচার্য্যগঠন ও নিয়োগের সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। সুপণ্ডিত আচার্য্যের অভাবে এবং অল্পতায় ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত উপাসক সংখ্যার অল্পতা ঘটিতেছে।

৪। আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান অপেক্ষা সমাজসংস্কারের দিকে ব্রাহ্মসমাজের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা। যাহাতে সর্ব্বসাধারণ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে,

যাহাতে ভিতরের চক্ষু খুলিয়া যায়, যাহাতে নিজ নিজ চেষ্টা ও অধ্যয়ন-ফলে লোকে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সেই দিকে প্রথম বয়সে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ব্রাহ্মসমাজের গতি সমাজসংস্কারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও সঙ্করবিবাহ, উপবীতত্যাগ, আহার-বিহারে অসংযম, শুধু ব্রাহ্মের নহে, শিক্ষিত মণ্ডলীরও লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা অবশ্য সমাজসংস্কারের বিরোধী নহি। কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারের জন্যই যে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই লক্ষ্যের দিকে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশের তীব্র দৃষ্টি না থাকায় ব্রাহ্মসমাজ জনসাধারণের চক্ষে হেয় হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মবিহীনতা, সাধনবিহীনতা, অধ্যয়ন-বিহীনতা নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বের গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

৫। ব্যক্তিগত সাধনের অভাব। আমরা মনে করি সপ্তাহান্তে একদিন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গেলেই আমাদের ধর্ম্মসাধনের পরিসমাপ্তি হইল। কিন্তু এই ভ্রান্তি অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্তি আর হইতে পারে কি না সন্দেহ। আমাদের প্রতিদিনের সাধনা চাই। প্রতিদিন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টা চাই। কিন্তু আজকাল কয়টা ব্রাহ্ম-পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উপাসনা আছে? কয়জনের মধ্যে সেই নিষ্ঠার ও ঐকান্তিকতার ভাব পরিলক্ষিত হয়?

৬। সংযমের অভাব। সংযমের উপরেই সকল ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। সংযম দ্বারাই আমাদের উদ্দাম প্রকৃতিকে বশে আনা যায়। আহার-বিহার সকল বিষয়েই সংযম চাই। সাত্ত্বিক আহার প্রবর্ত্তন করা চাই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যযুগে এমন একটি সুন্দরভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল যে তাহার ফলে অনেকে মৎস্য মাংস একেবারেই পরিহার করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বেচারাম বাবু প্রমুখ অনেকেই চিরজীবনের মত নিরামিশাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকালকার ব্রাহ্মসমাজ ঐরূপ কয়টি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন?

হিন্দুর মতে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে চলিতেছে। হিন্দুসমাজের অনেক নেতার পরিবারের মধ্যেও যে চলে তাহা আমরা জানি। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে ব্রাহ্মকে সংযমে, আহারে, ধর্ম্মসাধনে, নিষ্ঠায়, সত্যকথনে আদর্শ-জীবন যাপন করিতে হইবে। তবেই ব্রাহ্মগণ সাধারণের শ্রদ্ধা পাইবেন, সকলেই তাঁহাদের অনুরক্ত হইবে। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে সংযমবিহীন ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নামের যোগ্য হইতে পারে না। আজকালকার দিনে স্ত্রীজাতিকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দানের ফলে দুই চারিটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়াইতেছে; তদপেক্ষা মর্ম্মান্তিক অনুশোচনার বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলেও ইহা দ্বারা সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক রটিত হইতেছে। *

৭। ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের উপরে অতিরিক্ত প্রীতি। এমন অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহারা নানা কারণে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান নিজ নিজ গৃহে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাঁহারা অন্যদিকে সুপণ্ডিত সংযমী ত্যাগী ও আদর্শ-চরিত্র ও উপাসনাপরায়ণ। আমরা এইমাত্র বলিতে চাই নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মবিবাহাদিবিষয়ে অনুষ্ঠান ব্রাহ্মের পরিমাপক নহে। আজকাল অনেক পরিবারে বিশেষতঃ বিলাত-ফেরত পরিবারে ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান চলিতেছে, কিন্তু সাপ্তাহিক কি সাম্বৎসরিক উপাসনায় সমাজগৃহের গণ্ডী পর্য্যন্ত তাঁহারা স্পর্শ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মসমাজে চাঁদা স্বাক্ষর করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট অনাদায়ী প্রতিশ্রুত দানের পরিমাণ এত অধিক যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ব্রাহ্মসমাজ চাঁদার আশায় অনেকগুলি নিরীশ্বর লোককে লইয়া দলপুষ্ট করিতেছেন এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যা ব্রাহ্ম বলিয়া বিকাইতেছে, ইহা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে। ১৭৮৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা" লইয়া প্রবন্ধ বাহির হয়, প্রায় ঐ সময় হইতে অনুষ্ঠানের যুগ। উহার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ৩৩ পৃষ্ঠায় "সংবাদ সার" প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বলিতেছেন যে বম্বে ও মান্দ্রাজ প্রদেশে অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি আশ্চর্য্যভাব দেখিয়াছেন। উল্লিখিত প্রদেশের লোকেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানেতেই সেই ধর্ম্মের সত্যতার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, দশটি ব্রাহ্মসমাজে যে কার্য্য না হয়, একটি অনুষ্ঠানে তাহা হইতেও অধিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমাদিগেরও এইরূপ বিশ্বাস"। আমরা বলি কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের এই বহিরঙ্গ সাধনের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু আজকালকার দিনের অনুষ্ঠান বহু স্থলে কি ভাবে চলিতেছে তাহা বিবেচ্য। আমরা অনেক দৃষ্টান্ত জানি যে, বিবাহের সময় অনেকে অনুষ্ঠান করিয়াছেন কিন্তু তাহার পর হইতে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহাদের আর কোন যোগ নাই; অধিকন্তু পরে তাঁহারা ব্রাহ্মনাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের কথা এই যে অন্তরঙ্গ সাধন, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সর্ব্ববিষয়ে সংযম ভিন্ন কেবলমাত্র অনুষ্ঠানের উপরে ব্রাহ্মসমাজ টিঁকিবে না ও টিঁকিতে পারে না। †

* হিন্দুপরিবারেই এইরূপ বিবাহবিচ্ছেদ অধিকতর দেখা দিতেছে দৃষ্ট হয়। তঃ সং

† এই স্থলে আমরা বলিতে চাই যে ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর পক্ষে

৮। হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের নিন্দা ঘোষণা। আমরা জানি যে পুরাণ তন্ত্রের ভিতরে আপত্তিকর স্থান যথেষ্ট আছে। অন্য দিকে গ্রহণ করিবারও যথেষ্ট উপাদান বর্ত্তমান। খৃষ্টান পাদরির মত ত্রুটির উপর লক্ষ্য করিয়া বাক্যবাণ প্রয়োগে প্রকৃত লক্ষ্যসিদ্ধি হয় না। ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঐ পুরাণ তন্ত্রের ভিতর হইতে একেশ্বরবাদের পরিপোষক মন্ত্র উদ্ধার করিয়া যদি আমরা প্রচার কার্য্য চালাইতে পারি, তাহা হইলে বিরোধীগণকে আমরা নিরুত্তর করিতে পারি। শ্রোতৃগণকে নিন্দাবাদে ক্ষতবিক্ষত করিলে ব্রাহ্মসমাজের বাণী শ্রবণ করিবার সহিষ্ণুতা একেবারেই চলিয়া যায়। বিশেষতঃ আজকাল toleration মিলনের যুগ আসিয়া পড়িতেছে। প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে পুরাণ তন্ত্রের যাহা কিছু আপত্তিকর, তাহা আপনা হইতে খসিয়া পড়িবে এবং সত্য ভাস্বর হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মসমাজের অনেক আচার্য্য এই বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা না করিয়া নিন্দাবাদ ঘোষণে হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মসমাজের অকারণ বিরোধী করিয়া তুলেন। ইহারা মনে করেন যে নিন্দাবাদই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের উপায়। †

৯। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে মতবাদের পার্থক্য। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মসংখ্যার মধ্যে মতবাদের পার্থক্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রতিকূল পার্থক্য অনর্থক সৃষ্টি করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে এক সময়ে বেদ উপনিষদের প্রাধান্য ছিল, তৎপরবর্ত্তী সময়ে কোন দলে বাইবেলের প্রাধান্য সৃষ্টির আয়োজন হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় বেদ উপনিষদ-নিরপেক্ষ স্বাধীন চিন্তার যুগ। ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বে অবতারবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু অবতারবাদের গন্ধ কোন কোন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অনুভূত হওয়ায় অনেকে ইহার উপর বিতৃষ্ণ হইতেছেন। আবার কাহারও কাহারও ভিতরে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রীতি অতিরিক্ত পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের বিপরীত এসব মতবাদের সৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজের অবসাদ দশা অনুভূত হইতেছে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, আমরা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির বিরোধী যে কয়েকটি প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিলাম, তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি কথা বলিবার আছে, অনেক ব্রাহ্মের ঔদ্ধত্য ও অবিনয়ের ভাব উহার মধ্যে অন্যতম। তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহারা যাহা জানেন বা বুঝেন তদপেক্ষা জানিবার বা বুঝিবার আর কিছু নাই।

ব্রাহ্মসমাজ ত্রিবিধ শাখায় বিভক্ত হইলেও আমরা সকলেই মূলে সেই এক ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত। সম্প্রদায়গত ভাব পরিহার করিয়া সকলে স্থিরভাবে উল্লিখিত কারণগুলি আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের অবসাদ দূর করিতে প্রবৃত্ত হউন, ইহাতে নবজীবনের সঞ্চার করুন এবং রাজা রামমোহন রায়ের মহৎ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিয়া তুলুন। আমাদিগকে ইহাও মনে করিয়া রাখিতে হইবে যে সর্ব্বপ্রযত্নে সমগ্র হিন্দুসমাজকে আমাদের প্রচারের ক্ষেত্ররূপে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিয়া এই কার্য্যে কিছুতেই বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারিব না; হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত থাকিয়া হিন্দুর শাস্ত্রাবলম্বনে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় যদি আমরা মনোযোগী হই, তবেই আমাদের পথ সুগম হইবে। খৃষ্টানগণ হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে চান, কিন্তু সে পথ আমাদের পথ নহে। হিন্দুসমাজের সহানুভূতি লাভ করিয়া ভ্রাতৃভাবে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের জন্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মের সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্য স্থাপন জন্য যদি আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তবেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধান হইবে। ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের পথ ছিল এবং ইহাই আদি ব্রাহ্মসমাজের সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা। একথা সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে চিন্তা করিবার জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে যাহা কিছু মলিন তাহা আলোচনা প্রভাবে আপনা হইতেই উড়িয়া যাইবে, এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিক সত্য যাহা তাহা ক্রমে ভাস্বর হইয়া উঠিবে। উহা একদিনের কার্য্য নহে, ইহার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সময়ের ব্যবধান সঙ্কোচ করিলে চলিবে না। ইহাই ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাণী, আমরা ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিতে চাই।

রাজা রামমোহন রায়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মহাপুরুষ ও ভারতভূমি।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে কত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এই পুণ্যভূমি ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া

একেশ্বরবাদমূলক অনুষ্ঠানেরও বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। আমরা বলি, যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা, তাহা সেইরূপ অব্যাহত থাকুক। কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের উপাসনার পথে বিরোধ ঘটিবে, সেস্থলে সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে ঈশ্বরকেই ধরিয়া থাকিতে হইবে। এইখানেই একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যকতা ও সার্থকতা। তং সং

† বড় সত্য কথা। তং সং

এদেশকে পবিত্র করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই সকল মহাপুরুষদের ভিতর দিয়া ভগবানই আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্বাধীনতার পথে ভারতবাসীকে নিত্যই নব নব ভাবে আহ্বান করিতেছেন। মহাপুরুষদিগেরই আবির্ভাবে এই ভারতভূমি ধন্য হইয়াছে। যেদেশে মহাপুরুষ আবির্ভূত না হন, সে দেশ তো শুষ্ক, সে দেশ মরুভূমি সমান, সে দেশ শ্মশান। মহাপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে সংসারে আসিয়া প্রাণের ধারা ঢালিয়া দেন, জীবনের স্রোত চালাইয়া দেন। পিপাসাতুর মানব, সংসারের পাপতাপে দগ্ধপ্রায় মানব, সেই প্রাণের ধারা ও জীবনের স্রোত হইতে অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া অমৃতের ধারা পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই অমৃতধারা পানের অধিকার ও অবসর না থাকিলে জগতসংসার মানবের আবাসভূমিরূপে পরিচিত হইতে পারিত না, মাত্র জীবজন্তুর আবাসস্থানরূপে পরিগণিত হইত।

ধর্ম্মের গ্লানি ও মহাপুরুষের অভ্যুদয়।

ইহা একটি অক্ষয় সত্য—গীতা যাহা স্বর্ণাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন—যে, জগতে যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের মসীবর্ণ কালিমা ও ঘন অন্ধকার যখন জগতসংসারকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়, সেই সময়েই রুদ্রদেব ভগবান এক হস্তে উদ্যত বজ্র এবং অপর হস্তে বরাভয় লইয়া মহাপুরুষদের ভিতর দিয়া আবির্ভূত হইয়াই জগতে রুদ্ধ শান্তিধারা নবতর প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় পুনঃসংস্থাপন করেন। যখন দুঃখবেদনা, দারিদ্র্য ও পাপতাপের মরণবাহী বায়ুতে পৃথিবী ভরিয়া যায়, তখন ভগবান মহাপুরুষদের ভিতর দিয়া সুখশান্তি ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্বাধীনতার জীবনপ্রদ বায়ুতে পৃথিবী ভরিয়া দেন। পৃথিবীর অসহ্য উষ্মা তখন অন্তর্হিত হইয়া কল্যাণপ্রদ স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে; জনসাধারণের প্রাণে তখন ধর্ম্মের বিশুদ্ধ আনন্দধারা নামিয়া আসে। তখন সেই সকল মহাপুরুষদিগের প্রদর্শিত পথ ও প্রণালী ধরিয়া আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অগ্রসর হই এবং ধন্য হইয়া যাই। কেবল তাহাই নহে। যখন আমাদের মাথার উপর দিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বের ভয়ঙ্কর প্রবল ঝটিকা বহিবার উপক্রম হয়, তাহার বেগ আমাদের মত ক্ষুদ্রশক্তি সাধারণ মানবের পক্ষে সহ্য করিবার শক্তি কোথায়? সেই সময় পক্ষী যেমন বিপদের সময় শাবকগণকে স্বীয় পক্ষপুটের নিম্নে রাখিয়া বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করে, মহাপুরুষেরাও সেই সকল প্রবলবেগ দ্বন্দ্বঝটিকার আঘাত স্বীয় প্রশস্ত বক্ষে গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে বিনাশ হইতে রক্ষা করেন।

তর্পণ কি?

এই কারণে মহাপুরুষদিগের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই কারণে মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার অবসর পাইলে আমাদের হৃদয়মন তাহাতে স্বতই অগ্রসর হয়। যিনি যতই বলুন না কেন, এবং বর্ত্তমানে ধর্ম্মের বিপরীত বাতাস যতই বহুক না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষের ন্যায় ধর্ম্মগতপ্রাণ দেশ দ্বিতীয় নাই। ধর্ম্মের ভাব দেশের মজ্জাগত অস্থিগত হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসী প্রাণ হইতে ধর্ম্মকে ঝাড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিলেও পারিবে না। তাই কেবল সভাসমিতির ভিতর দিয়াই না করিয়া একটা ধর্ম্মানুগত প্রণালীর ভিতর দিয়াই পূর্ব্বপুরুষ ও মহাপুরুষ প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রথা বহু পুরাকাল অবধি এদেশে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। সেই প্রথার নাম হইতেছে তর্পণ।

মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে নিজের মঙ্গল।

মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার অবসর লাভের জন্য আমাদিগকে অধিক দূরে যাইতে হইবে না। শতাব্দীপ্রায় পূর্ব্বে যিনি সত্যধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা এবং তদনুষঙ্গে মানবাত্মার স্বাধীনতার সাফল্য প্রদানের জন্য সুদূর ইংলণ্ডে এই ২৭শে সেপ্টেম্বর দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার ভিতর দিয়া আমরা মহাপুরুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণের সুযোগ লাভ করিতেছি। এই সুযোগ হেলায় পিছলাইয়া যাইতে দিলে চলিবে না। এই মহাপুরুষের উদ্দেশে কেবল মুখস্থ নয়, কিন্তু অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিতে হইবে।

মহাপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করিলে শুধু আমাদের কর্ত্তব্য সাধন হয় না, কিন্তু তাহাতে আমাদের নিজেদেরও মঙ্গল সাধিত হয় —আমরা নিজেরাও তাঁহাদের আদর্শ, তাঁহাদের সুমঙ্গল বাণী অন্তরে ধারণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি। মার্কিণ কবি লংফেলোর উক্তি আমাদের প্রত্যেকেরই জানা থাকিলেও এক্ষেত্রে তাহার পুনরুক্তি নিশ্চয়ই অসঙ্গত হইবে না। তিনি প্রত্যেকের অন্তরের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "Lives of greatmen all remind us, We can make our lives sublime"—মহাপুরুষদের জীবন আমাদের অন্তরে এই সত্য জাগরূক করিয়া তোলে যে আমরাও তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া আমাদের জীবনকে সকল বিষয়ে সমুন্নত করিয়া তুলিতে পারি।

জীবনচরিত কি ভাবে লেখা উচিত?

কবির এই উক্তি যদি সত্য হয় এবং তাহা সত্য বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি, তবে আমরা বলিতে পারি যে, যে সকল জীবনচরিত আলোচনা করিলে আমাদের জীবন উন্নতির পথে ধাবিত হইবে, সেই সকল জীবনচরিতই জীবনচরিত নামের উপযুক্ত। সেই সকল জীবনচরিতই আলোচনার যোগ্য।

মহাপুরুষদিগের জীবন এমন ভাবে লেখা উচিত, যাহাতে তাঁহাদের মহদ্‌গুণ সকল, তাঁহাদের বাণী, পরিস্ফুট হয়, এবং যাহা আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান কালের এবং উত্তরকালের পাঠকগণের অন্তর সমুন্নত আশাভরসায় ভরিয়া উঠে, তাহাদের সমগ্র জীবন উর্দ্ধমুখী হইয়া ছুটিয়া চলে।

রাজা রামমোহন রায়ের দুইটী বাণী।

ভগবানকে আমরা অনন্তস্বরূপ বলি। তাঁহার স্বরূপ প্রকৃতই অনন্ত—তাঁহার জ্ঞান প্রেম সকলই অনন্ত। সেই অনন্ত রাজ্য হইতে এক একজন মহাপুরুষ এক বা একাধিক বাণী জনসাধারণকে দিবার জন্য সংসারে অবতীর্ণ হন। যে মহাপুরুষের নিকট যে বাণী আমরা লাভ করিব, সেই বাণীকেই কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া সেই মহাপুরুষের জীবনচরিত লেখা ও আলোচনা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আজ এই স্মৃতিসভায় যে মহাপুরুষের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছি, আমাদের দেখিতে হইবে যে, তাঁহার নিকট হইতে, তাঁহার ভিতর দিয়া, ভগবানের কোন্ বাণী আমরা লাভ করিয়াছি। আমি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, রাজা রামমোহন রায় আমাদিগকে দুইটী বাণী দিয়া গিয়াছেন—একটী হইতেছে, প্রকৃত সত্যধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক ভাব; দ্বিতীয়টী হইতেছে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, সকল দেশের মধ্যে, সকল জাতির মধ্যে মিলন স্থাপন করা। তিনি কেবলমাত্র এই দুইটী বাণী অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ছাড়েন নাই; মহাপুরুষের যাহা উপযুক্ত, তিনি এই দুইটী বাণীকে নিজের জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া সহজেই মহাপুরুষের আসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে অন্যান্য যে সকল কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখি, তাহা ঐ দুই মহামন্ত্র-সাধনেরই অপরিহার্য্য ফল। আজ শতাব্দী পরেও আমরা যে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য দিতে আসিয়াছি, আমাদের দেখিতে হইবে, আমরা তাঁহার প্রচারিত ঐ দুই মহামন্ত্রকে আমাদেরও জীবনে কার্য্যত পরিণত করিয়া তাঁহার প্রতি অন্তরের যথার্থ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছি কি না।

রামমোহন রায় মহাপুরুষ কেন?

যে সময়ে রাজা রামমোহন রায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, যে ভাবে তিনি দেশের মতিগতি সুপথে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ না বলিয়া থাকা যায় না। আমি তাঁহার কোন কোন জীবনীলেখকের ন্যায় তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইয়া দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইতে চাহি না; আমি তাঁহাকে মানুষ বলিয়াই দেখিতে চাহি এবং মানুষ হিসাবে দেখিয়াই তাঁহাকে কেন মহাপুরুষ বলিব তাহা অন্তরে বিচার করিব। তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিলে, আদর্শপুরুষ হিসাবে উপলব্ধি করিলে তাঁহার বাণী গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না। আমার এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, সে সময়ে ধনীগণ সত্যসত্যই বুলবুলির লড়াই

প্রভৃতি তুচ্ছ ও অন্যান্য অশ্লীল আমোদপ্রমোদে সময় কাটাইতে এবং নিদ্রা ও আলস্যে গা ভাসাইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। আমাদের বাল্যকালে ইহার আভাসমাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে ধনীদরিদ্রনির্বিবিশেষে সকলেরই অভিশাপ মাথায় লইয়া তিনি কিপ্রকারে কোন্ সাহসে "ভাব সেই একে" গাহিয়া, "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" গাহিয়া ধনীদিগের ভীমরুলের চাকে আঘাত করিয়া অক্ষত দেহমনে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন; কিপ্রকারে তাঁহাদের অনেকের মতিগতি সুপথে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, আমরা তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই। তিনি শত ক্ষতি স্বীকারেও উপনিষৎ প্রভৃতি প্রচার করিয়া ঐ জীবনের মহাবাণী অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মকে প্রতিপদে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হন নাই। পরিণামে আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডে উহাই স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া নিজের মহাপুরুষত্ব অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে একেশ্বরবাদ অনেক মহাপুরুষই ভারতে প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ একেশ্বরবাদের ভিতরে যে প্রকৃত সত্যধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক ভাব আছে, প্রকৃত সত্যধর্ম্ম যে স্থান ও কাল, দেশ ও জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের অতীত চিরন্তন ধর্ম্মরূপে জগতসংসারকে ধারণ করিয়া আছে, এই সত্যটী সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁহার পূর্ব্বে কেহই ঘোষণা করেন নাই। এখন আমাদের নিকট ইহা আমাদের, এবং ভারতের, এবং জগতের চিরন্তন সত্যরূপে প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে একথা কেহই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যতও হন নাই এবং পারেনও নাই।

রামমোহন রায়ের উদারতা।

এই সত্যের অপরিহার্য্য ও অবিচ্ছিন্নসম্বন্ধ অনুষঙ্গী সত্য হইতেছে—সকলের সহিত বিরোধপরিহার ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, সুতরাং স্বভাবতই সকল দেশ ও জাতির মধ্যে মিলন সংস্থাপন। এই তত্ত্বটা যে কত বড়, ইহার গুরুত্ব যে কতটা, আজ আমরা তাহা কল্পনাতেই আনিতে পারিব না। রাজা রামমোহনের প্রাণ যে কত উদার ছিল; সমগ্র বিশ্বে হউক বা না হউক, অন্তত দ্বন্দ্ববিবাদে, দ্বেষহিংসায় ক্ষতবিক্ষত এই ভারতভূমিতে এক অখণ্ড মিলন সংস্থাপনের জন্য তাঁহার প্রাণ যে কিপ্রকার কাঁদিয়া উঠিত, আজ আমরা তাঁহারই বিতরিত মহামন্ত্রে অনেকটা পরিপুষ্ট হইয়া সে উদারতা, সে আগ্রহের পরিমাপই করিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে মিলন সংস্থাপনের কথা উঠিলেই পূজ্যপাদ পিতামহদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাতরপ্রাণে বলিয়া উঠিতেন—রামমোহন রায় বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসনা সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, আর আমাদের মধ্যে বিবাদের অন্ত নাই! শুনিয়াছি, রাজা রামমোহনকে বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসনার কথা বলিতে বলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধবিবাদ স্মরণ করিয়া দরদরধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা যাইত। তাঁহার প্রাণের ভিতর আমাদের দেশে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ববিবাদ দ্বেষহিংসা যে কি গুরুতর আঘাত করিয়াছিল, তাহা আদিব্রাহ্মসমাজগৃহ সংস্থাপনের উদ্দেশ্য হিসাবে উহার ট্রাষ্টডীডে "strengthening the bonds of union between men of all religious persuations and creeds" এই কয়টী কথার উল্লেখ থাকাতেই প্রকাশ পাইতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে এদেশে রাম-রহিম এক, এই ভাবের প্রণোদক বিভিন্ন ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল সত্য; কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মতাবলম্বী জনগণের মধ্যে মিলন সংস্থাপনকে বিশেষভাবে উদ্দেশ্য করিয়া সংঘগঠনের প্রয়োজন প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা এবং তদুদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা, রাজা-রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে কেবল এদেশে কেন, সমগ্র জগতে কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না।

রামমোহন রায়ের দূরদৃষ্টি ও অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের বাণী।

মহাপুরুষেরা তাঁহাদের নিজ নিজ স্থান ও কালের সীমার অনেকটা উপরে উঠিয়া দেখেন। তাঁহাদের দৃষ্টি তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী স্থান ও কালমাত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না—স্বভাবতই দূরবর্ত্তী স্থান

ও কালের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে। কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা সহজেই অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে, স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য সংস্থাপন করেন। রাজা রামমোহন রায়ে আমরা ইহার সুন্দর পরিচয় পাই। তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন যে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা না হইলে এদেশে বিরোধবিবাদের অবসান হইবে না; তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন যে, এই সত্যধর্ম্মের বিষাণ অদূর ভবিষ্যতে বাজিয়া উঠিয়া শুধু ভারতভূমিকে নহে, কিন্তু সমগ্র জগতকে জাগাইয়া তুলিবে; কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে ইহাও সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন যে, অতীতের সহিত সম্বন্ধ সুরক্ষিত না করিলে ঐ সত্যধর্ম্ম গ্রহণীয় হইবে না। তাই তিনি অতীতের ভাবধারার সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া যে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের বাণী ঘোষণা করিলেন, আজ সেই বাণী শৃঙ্গধ্বনি ও দুন্দুভিবাদ্যসহকারে সমস্ত জগত জুড়িয়া বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইয়াছে। আজ শতাব্দী পরে, মুখে না হউক, অন্তত কাজে, সেই সত্যধর্ম্মের প্রতি একটা বিশ্বব্যাপী আগ্রহ ফুটিয়া উঠিতেছে।

রামমোহন রায় ও মিলনের বাণী।

সত্যধর্ম্মের বাণীর সঙ্গে তাহারই অপরিহার্য্য ও তাহার সহিত অবিচ্ছিন্নসম্বন্ধ সহচর মিলনেরও বাণী তাঁহার হৃদয়ে আশ্চর্য্যরূপ এবং স্বভাবতই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি "সেই এক"-কে উপলব্ধি করিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, সেই একের রাজ্যে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিবার যন্ত্র বিরোধবিবাদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না— মিলনের সুবাতাস যথাসময়ে বহিতে বাধ্য। তাঁহার ভাব এমন ছিল না যে, ব্যক্তিগত যত কিছু বিভিন্নতা আছে, সকলই ঘুচিয়া যাউক। তাঁহার প্রাণের কথা ছিল এই যে, মানুষের মধ্যে মতের বিভিন্নতা যতই কেন থাকুক না, তাহা লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ আনিবার কোনই প্রয়োজন নাই; কেবল ভগবানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক এবং তাঁহাকে জীবনের কেন্দ্রে রাখিয়া সকল কর্ম্ম করিতে থাক। এই ভগবদুপাসনার উপর অতীতে যুগে যুগে যে সকল বিধিনিষেধ গজাইয়া উঠিয়াছে, যথাসময়ে ও যথাস্থানে সে সমুদয়ের প্রয়োজন ও উপকারিতা খুব সম্ভব ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত বিধিনিষেধ অযথা বৃদ্ধি পাইয়া অনেকস্থলে ভয়াবহ রোগসমূহের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় বলেন এবং সর্ব্বপ্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কিরূপে ঐ সকল রোগবাহী বিধিনিষেধসমূহকে বিতাড়িত করিয়া এবং মঙ্গলপ্রদ বিধিনিষেধগুলিকে সুরক্ষিত রাখিয়া অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য সাধন পূর্ব্বক মিলনের পথে ভবিষ্যতে অগ্রসর হইতে হইবে। সকল ধর্ম্মসংস্কারকেরই মূলগত অন্তর্নিহিত ভাব এক থাকিলেও রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় অপর কেহ এই ভাবকে সুস্পষ্ট আকার দিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। অসাম্প্রদাদিক ভিত্তির উপর সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবার এবং ব্রাহ্মসমাজের উদারতম ট্রষ্টডীডে এই ভাবকে ব্যক্ত আকার প্রদান করিবার অধিকার রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে অপর কোনও ধর্ম্মসংস্কারকই লাভ করিতে পারেন নাই। এই ভাবই ভারতের কেন, সমগ্র জগতেরই পুরাতন বিধান, সনাতন বিধান; এবং যাঁহার বলিতে ইচ্ছা হয় বলিবেন, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সামঞ্জস্যের সোণার কাঠির স্পর্শে মিলনের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে আনাই হইল সমগ্র জগতের পক্ষে নববিধান।

রামমোহন রায় ও বর্ত্তমান যুগের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা।

আজ যাঁহার মহনীয় স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য এই পুণ্য দিবসে মিলিত হইয়াছি, তিনি অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন, এই দুই মহামন্ত্র কেবল কাগজে কলমে নহে, কিন্তু কার্য্যত জীবনে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা, ছুঁৎমার্গ পরিহার, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি দেশের কল্যাণজনক ভাবসকল ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইল। শতাব্দী পরে আজ আমরা দেশের উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিতেছি, ভগবানের আদেশে, তাঁহার বাণী লইয়া রাজা রামমোহন রায় অবতীর্ণ না হইলে এবং মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন এইভাবে ঐ বাণক সাফল্যে

মণ্ডিত করিবার চেষ্টা না করিলে আমরা ঐ সকল কার্য্যে এই শতাব্দীর মধ্যে অগ্রসর হইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। তাঁহাকে যদি আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা করি, তবে সে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এক মাত্র উপায় তাঁহার প্রদর্শিত পথে স্থিরগতিতে অগ্রসর হওয়া। তাঁহাকে আদর্শ ধরিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে যে দিন সমগ্র জগতবাসী না হৌক, অন্তত ত্রিশকোটী ভারতবাসী দ্বেষহিংসা ও বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া ভারতের চিরপুরাতন দেবতা একমাত্র পরমেশ্বরের পবিত্র নামখচিত অজেয় পতাকা বহনে অগ্রসর হইবে, সেই দিন রাজা রামমোহন রায়ের জয়। সেইদিন ভারতের মুকুটতলে সমগ্র জগৎ মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইবে। সেইদিন না চাহিতেই সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল ভারতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে; সেই দিন ভারতে স্বরাজ স্বতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

জয় ভগবানের জয়।

দ্রৌপদী কি পাণ্ডবগণের "বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী"? *

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল)

দ্রৌপদীর জন্ম।

আচার্য্য দ্রোণ ও তাঁহার কুরু-শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত, হতমান দ্রুপদ রাজা—কি প্রকারে আত্ম-অপমানের প্রতিকার করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত যদি কোনরূপ দৈবকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পুত্রোৎপাদন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

মহাতপা মহর্ষি উপযাজ দ্রুপদের দ্রোণান্তক-পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে "আহুতি প্রদান করা মাত্র সহসা হুতাশন মধ্য হইতে দেবকুমারতুল্য সুকুমার এক কুমার উত্থিত হইলেন। তৎকালে দৈববাণী এবং জনগণের হর্ষ-কোলাহল অবসর মধ্যে "সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী যজ্ঞবেদি মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন ও দৈববাণী হইল—এই কন্যা কালক্রমে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করিয়া বিস্তর সুরকার্য্য সাধন করিবেন, ইহার নিমিত্ত কুরুবংশীয়দিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকিবে।" এই কন্যাই—দ্রৌপদী। *

দ্রুপদ চাহিলেন—দ্রোণহন্তা পুত্র—জন্মিল যমজ পুত্র ও কন্যা। কন্যা সম্বন্ধে উক্ত দৈববাণী—কন্যার বিধিলিপি ও দ্রোণবধের সহিত দ্রৌপদীর জন্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংস্পৃষ্ট—ইহাই যেন বিধাতার ইঙ্গিত।

স্বয়ম্বর সভা।

সম্ভবতঃ দ্রৌপদীর উক্ত প্রকার বিধিলিপি বশতঃই কর্ণ লক্ষ্যভেদে সক্ষম হইলেও দ্রৌপদী কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া জ্যারোপিত ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। নচেৎ কর্ণের লক্ষ্যলাভে কুরুবংশে প্রবিষ্টা হইলে দ্রৌপদী কুরুবংশীয়াদের ভয়স্থানীয়া হইতেন না। দ্রোণের বিরুদ্ধ পক্ষে তাঁহার থাকা দরকার, তাহাও হইত না; এবং ইতিহাসও হয় ত ভিন্নরূপ হইত।

দৈববিধি—কুরুবিরোধী ছদ্মবেশী অর্জ্জুনের গলেই দ্রৌপদীর মালা পড়িল; পার্থও দ্রৌপদীদত্ত মালা গ্রহণপূর্ব্বক পত্নী সমভিব্যাহারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।" †

দ্রষ্টব্য :—অনুষ্ঠাতব্য স্বয়ম্বর; তদনুসারে মাল্যদান সমাপনান্তে দ্রৌপদীর অর্জ্জুনপত্নীত্ব ব্যাসদেব কর্ত্তৃক স্বীকৃত—এস্থলে কেবল বিবাহের অন্যান্য আচারাদি বাকী রহিল।

---

* লেখক শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ সম্প্রতি মহাভারত ইতিহাসের দিক হইতে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার "কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকার" প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে দেখান। আমি তাহাতে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার প্রচুর উপকরণ দেখিলাম। যদিও আমাদের চিরপোষিত মতের সহিত প্রবন্ধোক্ত মতের অনেক পার্থক্য দেখিলাম, তথাপি এবিষয়ে স্বাধীন ঐতিহাসিক আলোচনার উদ্দেশ্যে তাহা প্রকাশ না করা সঙ্গত বোধ করিলাম না; বরঞ্চ প্রকাশ করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সম্মতিতে উহা পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এবিষয়ে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনা হউক। ইতিমধ্যে দেখি, এবিষয়ে শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস-সি, বি-এল এবং ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এম-এ, বি-এল বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া প্রেমানন্দ বাবুর প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। প্রেমানন্দ বাবু ক্ষেমেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা নিরপেক্ষভাবে এবিষয়ে সপ্রমাণ যিনি যাহা কিছু পাঠাইতেছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছি।

প্রেমানন্দ বাবু এবার দ্রৌপদী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও আমাদের চিরপোষিত মতের ও ধারণার বিরোধী। কিন্তু শুধু ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্য হইবে বলিয়া উহা আমরা প্রকাশ করিতেছি। প্রেমানন্দ বাবুর এই দুইটী প্রবন্ধের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত মতের কোনও সম্বন্ধ নাই। এবিষয়ে মতামতের জন্য প্রেমানন্দ বাবু স্বয়ং দায়ী। প্রেমানন্দ বাবু যাহা লিখিতেছেন, মহাভারত হইতে তাহার স্বপক্ষে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছেন। সুতরাং ইতিহাসের দিক হইতে এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশের বিরুদ্ধে আমাদের কোন কথাই বলিবার নাই। এই সকল প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনা প্রার্থনীয়। এবিষয়ে আলোচনা করিয়া যাঁহারা প্রমাণসহ প্রবন্ধ পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। তঃ সং

* মহাভারত, আদি, চৈত্ররথ, ১৬৭ অধ্যায়, ১০৮ পৃঃ।

† ঐ আদি স্বয়ম্বর ১৮৭ অধ্যায় ১১৮ পৃঃ।

সভান্তে—গৃহে।

ধর্ম্মপ্রস্তাব।

স্বয়ংলব্ধা দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে পঞ্চপাণ্ডব ভার্গবের কর্ম্মশালায় প্রত্যাগত হইলে প্রত্যহের ন্যায় গৃহাভ্যন্তরস্থিত কুন্তী না জানিয়া তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন—"যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।" কিন্তু পরে প্রাপ্ত বস্তু যে দ্রুপদরাজকন্যা তাহা জানিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া, বলিয়াছিলেন—"আমি অনবধানতা বশতঃ আজ্ঞা করিয়াছি…এক্ষণে যাহাতে…অধর্ম্ম দ্রুপদকুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর।" যুধিষ্ঠির "জননীর এইরূপ উক্তিশ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কুন্তীকে আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন—হে ফাল্গুন! যাজ্ঞসেনী তোমারই জয়লব্ধ বস্তু, তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন, তুমি অগ্নিসাক্ষী করিয়া যথাবিধানে ইহার পাণিগ্রহণ কর।" *

দ্রষ্টব্য :—"সকলে সমবেতভাবে" ভোগ করিলে যে দ্রৌপদীকে পাপ বা অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে, ইহা কুন্তী এবং যুধিষ্ঠির ফলতঃ পাণ্ডবগণ সকলেই জ্ঞাত ছিলেন। স্বয়ম্বর-প্রথানুযায়ী দ্রৌপদী যাঁহার গলে প্রথমেই মাল্যদানপূর্ব্বক পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং দ্রৌপদী কর্ত্তৃক যাঁহার পত্নীত্বপ্রাপ্তি উপরে দৃষ্ট হইবে যে, ব্যাস কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছিল; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে একমাত্র সেই অর্জ্জুনই দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিলে দ্রৌপদীর ধর্ম্মরক্ষা হইত, কিন্তু তাহা হইয়াছিল কি?

অধর্ম্ম্য প্রস্তাব—উহার মূল।

পঞ্চ ভ্রাতায় দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিলে দ্রৌপদীকে পাপস্পর্শ করিবে জানিয়াও যুধিষ্ঠির স্বয়ং সেই প্রস্তাব উত্থাপন, সমর্থন ও কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন কেন?

তদুত্তর এই—"পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করতঃ উপবিষ্ট ও তদ্গতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনঙ্গবিকার প্রাদুর্ভূত হইল।…… যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের বাক্যসমুদয় স্মরণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জ্জনে লইয়া কহিলেন, দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন।" †

দ্রষ্টব্য :—পঞ্চভ্রাতা কর্ত্তৃক একই স্ত্রীবিবাহে অধর্ম্ম হইবে জানিয়াও—পাছে ভ্রাতৃগণ মধ্যে স্ত্রী লইয়া মনোমালিন্য, ছাড়াছাড়ি ও দলভঙ্গ হয় এই জন্যই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিরুদ্ধে পঞ্চভ্রাতার মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার নিমিত্ত "ভেদভয়ে" যুধিষ্ঠির ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহা রাজনৈতিক মতলববাজি বা চাল (political expediency) ব্যতীত আর কি?

অধর্ম্ম্য অনুষ্ঠান। *

দ্বিজবেশী ভ্রাতৃপঞ্চকের পরিচয়-লাভান্তে পাণ্ডবদিগকে রাজ্যদানের আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক দ্রুপদরাজা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে—"অর্জ্জুন আভ্যুদয়িক ক্রিয়ান্তে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন।" যুধিষ্ঠির স্বীয় "দারসম্বন্ধ কর্ত্তব্য হইয়াছে" প্রকাশ করায় দ্রুপদ দ্বিতীয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, "যুধিষ্ঠির স্বয়ং বা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি দ্রৌপদীকে বিবাহ করুন।" তখন যুধিষ্ঠির প্রকাশ করিলেন "দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন।"

দ্রষ্টব্য—অধর্ম্ম্য প্রস্তাব করিতে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরেরও সম্ভবতঃ 'বাধ-বাধ' ঠেকিয়াছিল—তাই তিনি ক্রমশঃ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন—একেবারেই উহা উত্থাপন করিতে সাহসী হন নাই।

যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব শুনিয়া দ্রুপদ কহিয়াছিলেন—"এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই। … ..লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ উচিত হয় না।"

দ্রষ্টব্য :—পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া এক পত্নী গ্রহণে দ্রুপদের আপত্তি; এবং তাঁহার মতেও এই প্রকার বিবাহ (১) অশ্রুতপূর্ব্ব (২) লোকাচার ও (৩) বেদবিরুদ্ধ (৪) অধর্ম্ম-কর্ম্ম।

দ্রুপদের উক্তির উত্তরে—যুধিষ্ঠির উক্ত প্রস্তাব যে ধর্ম্মসঙ্গত তাহার সমর্থন হেতু চারিটি কারণ প্রথমে দেখাইয়াছিলেন; যথা (১) "আমার মুখে অনৃতবাক্য কদাচিৎ উচ্চারিত হয় না", (২) "আমার হৃদয়েও অধর্ম্ম কদাচ স্থানলাভ করিতে পারে না", (৩) "বিশেষতঃ আমাদের জননী এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন", (৪) "আমারও ইহা মনোগত বটে।"

যুধিষ্ঠিরের যুক্তিতেও দ্রুপদের আপত্তি দূর হয় নাই। এতাদৃশ আলোচনাকালে তথায় মহর্ষি দ্বৈপায়ন সমুপস্থিত হইলে দ্রুপদ তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন—একা দ্রৌপদী কিরূপে অনেকের ধর্ম্মপত্নী হইবেন? কিন্তু সঙ্কর হইবেন না, ইহা কিরূপে হইতে পারে? ব্যাসদেব কহিলেন—"লোকাচারগর্হিত ও বেদবিরুদ্ধ এই দুরবগাহ ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদের কাহার কি মত?" ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য :—দ্রৌপদীর পঞ্চপতিবরণকে লোকাচারগর্হিত

* মহাভারত—আদি, স্বয়ম্বর ১৯১ অধ্যায় ১২০ পৃঃ

† ঐ ,, ,, ১৯১ ,, ১২০ পৃঃ

* মহাভারত—আদি, বৈবাহিক ১৯৩ হইতে ১৯৮ অধ্যায়—১২২ হইতে ১২৪ পৃঃ।

ও বেদবিরুদ্ধ স্বীকার করিয়াও বেদব্যাস উক্ত কার্য্যকে "ধর্ম্মবিষয়" বলিতেছেন। কি উদ্দেশ্যে, তাহা পরে দেখা যাইবে।

ব্যাসবাক্যের উত্তরে দ্রুপদ কহিলেন,—"একস্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী ইহা কদাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা মহাত্মা প্রাচীন পুরুষদিগেরও আচরিত ধর্ম্ম নহে এবং গুণবান ব্যক্তিরাও কখনও এরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না।" ধৃষ্টদ্যুম্নও কহিলেন—"জ্যেষ্ঠ সুশীল ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যায় কিরূপে গমন করিবেন?...... অতএব কৃষ্ণা যে পঞ্চস্বামীর মহিষী হইবেন, ইহা আমরা কোনরূপেই ধর্ম্মতঃ অনুমোদন করিতে পারি না।"

দ্রষ্টব্য :—দ্রৌপদীর পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপতির বিবাহপ্রস্তাবের বিরোধী।

অনন্তর কুন্তীও ব্যাসদেবকে বলিলেন—"যুধিষ্ঠির যাহা কহিয়াছেন" (অর্থাৎ লব্ধবস্তু পঞ্চপুত্রকর্ত্তৃক বিভাগ করিয়া লইতে) তাহা তিনি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু "কিরূপে এই মিথ্যা হইতে ত্রাণ পাইব?"

দ্রষ্টব্য :—পঞ্চ ভ্রাতা কর্ত্তৃক একই স্ত্রীকে বিবাহ যে মিথ্যাচার ও তাহা যে বিধিসঙ্গত নহে কুন্তীও ইহা জানিতেন এবং যুধিষ্ঠির বা অন্য কাহারও বাক্যচাতুর্য্যে কুন্তীর সে ধারণা যে দূর হয় নাই, তাহা তাঁহার উক্ত উক্তি হইতেই পরিস্ফুট।*

তৎপরে ব্যাসদেব কুন্তীকে কহিলেন—"হে ভদ্রে! তুমি অনৃত হইতে ত্রাণ পাইবে।" এবং দ্রুপদকে বলিলেন—"হে পাঞ্চাল, আমি ইহার (অর্থাৎ একস্ত্রীর সহিত পঞ্চপুরুষের বিবাহ) নিগূঢ় তাৎপর্য্য সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিব না। যেরূপে উহা ধর্ম্মবিহিত ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল আপনিই শুনিতে পাইবেন।" ইত্যাদি। "তদনন্তর ভগবান দ্বৈপায়ন গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুপদের করগ্রহণ পূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।"

তথায় অন্যের অজ্ঞাতে কি কথা যে হইয়াছিল তাহা মহাভারতে প্রকাশ নাই। তবে পরবর্ত্তী ১৯৭ অধ্যায়ে কুন্তী প্রভৃতির সাক্ষাতে ব্যাসদেব দুইটী গল্প করিয়াছিলেন —প্রকাশ। ঐ গল্পদুইটীর পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বা সামঞ্জস্য আদৌ নাই; অথবা উহা হইতে আদৌ ইহা প্রতীতি হয় না যে, এক স্ত্রীর বহুপতিত্ব "ধর্ম্মবিহিত ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।" ঐ গল্প দুইটীকে আষাঢ়ে বা cock and bull story বলা যাইতে পারে। সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করিলে মনে হয়, উক্ত গল্প দুইটী প্রাকৃত বা সাধারণ জনগণের নিকট নিন্দনীয় হইতে না হয়, এইজন্য তাহাদের উদ্দেশ্যে কল্পিত মাত্র।

যাহা হউক, গল্প দুইটীর মোটামুটি প্রতিপাদ্য বিষয় এই ছিল যে, দ্রৌপদীর "বরাতে" "পঞ্চস্বামী বিধাতা বা শিব কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও দৈবসংযোগ ব্যতিরেকে কখন কি ধরাতল হইতে অলোকসামান্য স্ত্রীরত্ন সমুৎপন্ন হইতে পারে?" "এখন আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন।" ইত্যাদি

দ্রুপদের ন্যায় ধীমান রাজা যে ব্যাসের নিতান্ত আজগুবি ও অসঙ্গত গল্প বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। এইহেতু প্রকাশ্যে উক্ত গল্পদ্বয়ান্তে তিনি ব্যাসদেবকে কহিয়াছিলেন "যখন মহাদেব এইরূপ বিধান করিয়াছেন তখন ইহাতে ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, আমি এবিষয়ে অপরাধী নহি। পাণ্ডবেরা ইহার পাণিগ্রহণ করুন।" ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য :—(১) ব্যাসের খাতিরে ও অনুপস্থিত শিবের দোহাই দিয়া দ্রুপদ নিজ দায়ীত্ব দেবতার স্কন্ধে লোকতঃ চাপাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দায়মুক্ত হইয়াছিলেন মাত্র—সন্দেহমুক্ত হন নাই—হইলে, "আমি অপরাধী নহি" ইত্যাদি বলিতেন না। (২) আরও একটা কথা প্রণিধানযোগ্য যে এই আশ্চর্য্যা নারীর আবির্ভাবকালে দৈববাণীতে বা অন্যত্র কোথাও পঞ্চপতিত্ব উল্লেখ হয় নাই, বিবাহকালে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক "অন্তরাল" পরিপূর্ণ হইয়াছিল!

তথাকথিত—বিবাহ।

উক্ত প্রকার আলোচনাদির পর যে বিবাহ (?) বা বিবাহাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে যে, সত্যই পাঁচজনের সহিতই কি বিবাহ হইয়াছিল?

মহাভারতে দেখা যায় যে,—(আদিপর্ব্ব—১৯৮ অধ্যায়) কেবল মাত্র যুধিষ্ঠিরের সহিত যথাবিধি দ্রৌপদীর বিবাহাচারাদি সম্পন্ন করতঃ রাজপুরোহিত "যুধিষ্ঠিরকে অনুমতি করিয়া রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।" তাঁহার ফিরিবার কথা আর উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ অপর চারি জনের সহিত বিবাহদানে তাঁহারও মত ছিল না বলিয়াই তিনি আর ফিরেন নাই। যদিও তারপর— "অপর পাণ্ডবেরা উল্লিখিত প্রণালীক্রমে সেই বররঙ্গিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন।" যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর পাণ্ডবে

* যে কুন্তী আপৎকালে স্বামী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও চতুর্থবার পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন—"স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্য্যন্ত পরপুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে, তিনবারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষান্তর-সংসর্গ করিতে পারে না। যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে তাহাকে স্বৈরিণী কহে, পাঁচবার উক্ত কার্য্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যাপদবাচ্য হইয়া থাকে।" (মহাভারত আদি, সম্ভব, ১২৩ অধ্যায়—৮০ পৃঃ)—সেই কুন্তী যে এবম্প্রকার বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

গণের সহিত এই বিবাহ রাজপুরোহিতকে বাদ দিয়াই হইয়াছিল বলিয়াই সন্দেহ হয়। এবং তাহা হইয়া থাকিলে এবম্প্রকার বিবাহ কতদূর সিদ্ধ তাহা বিবেচ্য। আমার মনে হয় দ্রৌপদীর যথাবিধি বিবাহ কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই হইয়াছিল, তাই দ্রৌপদী কুরুসভায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক অপমানিতা হওয়া কালে কহিয়াছিলেন—"আমি যুধিষ্ঠিরের সবর্ণা ভার্য্যা"—পাণ্ডবগণের "সাধারণী ভার্য্যা" বলেন নাই। *

যাহা হৌক বেদব্যাসের প্রভাবে ও মধ্যস্থতায় সকল আপত্তি নিরসন পূর্ব্বক মানুষের inequities এইভাবে দেবস্কন্ধে চাপাইয়া দিবার পর পঞ্চ ভ্রাতার সহিত দ্রৌপদীর তথাকথিত বিবাহ (?) বা বিবাহাচারাদি সম্পন্ন হইল। এবং ইহাকে যদি বিবাহ বলা যায়, তবে উক্তরূপ বিবাহান্তে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নানারূপ যৌতুক দিলেন।

দ্রষ্টব্যঃ—স্বয়ম্বর নিয়মানুসারে দ্রৌপদী কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে মাল্যদান ও দ্রৌপদীর অর্জ্জুনের পত্নীত্বপ্রাপ্তি ইতিপূর্ব্বেই মহাভারতে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং তৎপরে একের পত্নীকে পাঁচজনের বিবাহ কিরূপ বিধিসঙ্গত তাহাও বিবেচ্য। অন্ততঃ শঙ্খ, লিখিত, পরাশর বা অন্য কোন সংহিতা বা পুরাণাদিতে এরূপ বিবাহের সমর্থনযোগ্য কোনও বাক্যই নাই, যা আমি কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিবাহ।

পাণ্ডবগণের লাভ।

বারণাবত হইতে পলায়নপূর্ব্বক যৎকালে পাণ্ডবেরা একচক্রা নগরীতে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে একদা ব্যাসদেব তথায় আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে দ্রুপদরাজ্যে তাঁহাদিগকে যাইতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, দ্রুপদনন্দিনী "তোমাদিগেরই সহধর্ম্মিণী হইবেন। অতএব তোমরা এক্ষণে পাঞ্চাল নগরে অবস্থান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, সেই কন্যা লাভ করিয়া তোমরা ভবিষ্যতে সুখী হইবে।" †

তদনুসারেই পাণ্ডবগণ একচক্রা ত্যাগ করতঃ পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করিলেন। ‡

তথায় দ্রৌপদীকে লাভ করিলে পর নিঃসহায় পাণ্ডবগণের সহায় জুটিলেন (১) শ্রীকৃষ্ণ ও (২) দ্রুপদ।

আদিপর্ব্বের দ্বিশততম অধ্যায়ের ধৃতরাষ্ট্রবাক্য প্রতিধ্বনিত করিয়া পাণ্ডবগণ পক্ষে বলা যায়—"কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!"…"সবান্ধব দ্রুপদের সহিত মিত্রতা করিয়া কোন্ ক্ষত্রিয় কৃতকার্য্য হইতে বাসনা না করে?"

ফলতঃ এই বিবাহ দ্বারা ব্যাসদেব নিঃসহায় পাণ্ডবগণকে সহায়সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহা রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধি মাত্র। এইরূপ উদ্দেশ্য যে ব্যাসদেবের পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহা তৎকর্ত্তৃক একচক্রা হইতে পাঞ্চালদেশে পাণ্ডবগণকে প্রেরণ ও প্রেরণকালের উক্তি হইতেই পরিস্ফুট।

দ্রুপদের লাভ।

"পাণ্ডবগণ সহায় হওয়াতে দ্রুপদের দেবতা হইতেও আর শঙ্কা রহিল না।" *

দ্রুপদ ও পাণ্ডবগণ উভয় পক্ষই ক্ষমতাশালী হইলেও উভয় পক্ষই কৌরবভয়-ভীত ছিলেন। দ্রৌপদীর সহিত বিবাহ হওয়ায় একদিকে পরস্পরের শক্তি মিলিত হইল, অপর দিকে দ্রৌপদী যৌনসম্বন্ধ দ্বারা ভ্রাতৃপঞ্চকের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য দৃঢ়তর ও একতা স্থায়ী হইয়াছিল; এবং এই বিবাহব্যাপারাদি সংঘটনকালে যাদবকুলেরও সহিত মিত্রতা হইল। ফলে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণকে কেন্দ্র করিয়া যাদব ও পাঞ্চাল উভয় কুলের বলাবল একত্র হইল। এই মৈত্রীবন্ধনের ফল বহুদূর ও বহু কালব্যাপী; এবং ইহার পরিণামেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে "দেবকার্য্যসাধন" সম্ভব হইয়াছিল।

মীমাংসা।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বোঝা যাইবে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন নিমিত্ত দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের যে বিবাহ (?) বা বিবাহাচারাদি সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অশাস্ত্রীয়, লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ ছিল; এবং বেদশাসিত ভারতবর্ষে তৎকালে বা কোনও কালে উক্তরূপ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। সোজা কথায়—উহা বিবাহই নহে। দ্রৌপদীর সঙ্গে যে পাণ্ডবগণের ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ হয় নাই, কেবল দ্রৌপদীর যৌনসম্বন্ধ দ্বারা পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে একতা রক্ষা হইয়াছিল মাত্র, ইহা পাণ্ডবেরাও যেমন জানিতেন—শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ জানিতেন।

সেই হেতু দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যকালে সন্ধি-প্রস্তাব ভঙ্গ হইলে পর কর্ণকে কুরুপক্ষ হইতে ভাঙ্গাইয়া

* মহাভারত সভা দ্যূত ১৬৭অধ্যায় ১৮২ পৃঃ। তবে কি অপর চারি ভ্রাতা দ্রৌপদীর সহিত "অসবর্ণ" ছিলেন? স্বয়ম্বরসভায় অর্জ্জুনের গলে মাল্য দিয়াও যুধিষ্ঠিরের সহিত "যথাবিধি" বিবাহিত হইলেন কেন? এইসকল বিষয় আলোচনা করিলে ভারতের তৎকালীন ইতিহাসের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে নিঃসন্দেহ।

† মহাভারত আদি চৈত্ররথ ১৬৯ অধ্যায় ১০৮/১০৯ পৃঃ।

‡ " " ১৬৮ অধ্যায় ১০৮ পৃঃ।

* মহাভারত—আদি, বৈবাহিক ১৯৯ অধ্যায় ১২০ পৃঃ।

পাণ্ডবপক্ষে আনয়নপ্রয়াসকালে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে একান্তে লইয়া কহিয়াছিলেন যে, কর্ণ পাণ্ডবপক্ষে আসিলে পাণ্ডবগণ কর্ণকেই রাজ্যে অভিষেক করিবেন ও "দ্রৌপদী দিবসের ষষ্ঠভাগে তোমার (কর্ণের) সমীপে আগমন করিবেন"।*

দ্রৌপদী যদি এক, এমন কি পঞ্চ পাণ্ডবেরই ধর্ম্মপত্নী হইতেন এবং অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে তদনুরূপ মান্য প্রদান করিতেন, তাহা হইলে তিনি কি কদাচ এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিতেন? কখনই নয়।

——

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ

(শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী)

জীবনের বেশী সময় দিয়া যদি কিছু ভাবিয়া থাকি তবে তাহা ব্রাহ্মসমাজ। এই সঙ্গে গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সমাজের ভাবনা ভাবিতে গিয়া, আদৎ যে ধর্ম্মসাধন সেই পথেই বাধা ঘটিতেছে প্রবল। জীবনের এই কথা বলিতে গিয়া আমার কোন স্পর্দ্ধা কিম্বা শ্লাঘার কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না। যাক্; সমাজ সম্বন্ধে যাহা আমি ভাবি, তাহার অনেক কথাই কয়েক বৎসর হইতে সাবধানতার সঙ্গে—সত্যই সকল দিক সামলাইয়া 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। মনে পড়ে যেন ১লা কি ১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে "বিপদের দিনে" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক আদর্শচ্যুতির কথা যতটা বলা সম্ভব তাহা বলিয়াছি। তখন মনে হইয়াছিল আমি বুঝি ব্রাহ্মসমাজের ভিতরের কথা এমন করিয়া বলিয়া ফেলিয়া কিছু একটা অপরাধ করিলাম। কিন্তু শ্রাবণ-সংখ্যা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় "শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়" মহাশয় লিখিত "ব্রাহ্মসমাজের পতনের কারণ"-শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া অবাক্ হইলাম! কারণ অনেকেই যাহা ভাবিয়া গভীর ব্যথা অনুভব করি, কিন্তু সব দিক ভাবিয়া যাহা বলিতে বাধা পাই—মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে সংশয় উপস্থিত হয়, শুভব্রত বাবু তাহা খোলাখুলি ভাবেই বলিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে শুভব্রত বাবুর উদ্দেশ্য অশুভ হইবে না। তিনি যুবক কি প্রবীণ তাহা জানি না; তবে লেখা পড়িয়া মনে হয়, তিনি সত্যকামী সংগ্রাম-নিরত উৎসাহী ধর্ম্মশীল যুবক। তিনি ব্রাহ্ম কিম্বা সহানুভূতিকারক তাও জানি না। যাই হউন, তিনি পরম মঙ্গলের জন্যই ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্নিহিত লুক্কায়িত পাপব্রণের উপরে শাণিত ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচার করিয়াছেন। এ অস্ত্রোপচারে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু বাধা দিবার কাহারো কোন অধিকার নাই। সংবাদপত্রে ব্রাহ্মসমাজের বাস্তব গ্লানিপ্রকাশে উদার ধর্ম্মসমাজের দাবীই বহাল থাকিতেছে, তদ্বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রবন্ধের ভাষা আশাময়ী, ভাব সুস্পষ্ট; ইহার সূত্র ও তথ্য ভিত্তিহীন নহে। আমি বিশ্বাস করি, এরূপ প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজের আলোচনা ও আন্দোলন মঙ্গলেরই কারণ।

পতনের কারণ সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন, "পরিবারে ধর্ম্মসাধন নাই—ইহাই পতনের মুখ্য কারণ"; আমি বলিব উহা বহু কারণের ভিতরে অন্যতম কারণ। সকল কারণগুলি খুলিয়া বিস্তৃত করিয়া লিখিবার অবসর আজ হইতেছে না। দুইএকটি মাত্র উল্লেখ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

প্রথম কথা সমাজ একদিনে গড়ে না। মূলে যাহা থাকে, কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ফুল-ফল তাহা আকর্ষণ করিলেও বহুদিন পরে শাখা-প্রশাখা আর সে স্নিগ্ধ সজীবতা রক্ষা করিতে পারে না। তখন বিকার অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কিম্বা ধর্ম্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতাগণ কতিপয় শুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ লইয়াই মিলিত হন। ক্রমে সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতাগণের ত্যাগ ও শুদ্ধতা, প্রেম ও উদারতা, সাধননিষ্ঠা ও তপস্যার হ্রাস হইয়া চলে; ইহা ধর্ম্ম-ইতিহাসেরই সাক্ষ্য। তবে এক শত বৎসর এই অল্প কালের ভিতরে ব্রাহ্মসমাজে এমন ভাঁটা আসিবে, ইহা কেহ বড় ভাবিতে পারে না।

"জাত ব্রাহ্ম" অর্থাৎ "পঞ্চম জাতিসৃষ্টি" কথাটার উপরেই লেখক খুব জোর দিয়াছেন। ইহা সত্য হইলেও দুঃখ করা ব্যতীত প্রতিকারের উপায় বিশেষ কিছু আছে কি না বুঝি না; কারণ এ যে বর্ত্তমান যুগের স্বাধীন বিচার ও ব্যক্তিত্বপ্রধান সমাজ। ধর্ম্মকে উড়াইয়া দিলে বা নীতিকে পদদলিত করিলে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা বিনাশের দিকে চলিয়াছে; অথচ অনেক ধার্ম্মিক পিতামাতার শক্তির অতীত হইয়াছে ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে গতিশীল করিয়া রাখা। দৃষ্টান্তপ্রদর্শনে মঙ্গল হইবে না। বুঝিতে হইবে—স্বাধীন বিচারের দিনে ব্রাহ্মের পুত্র হিন্দু হইতে পারে—বা হইয়াছে, খৃষ্টান হইতে পারে—নাস্তিক হইতেও বাধা কি আছে? আবার ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই কি তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে? এরূপ কত কথাই উত্থাপন করা যাইতে পারে।

তার পর ভাবিতে অনুরোধ করি—রামমোহনের আত্মীয়সভা, দেবেন্দ্রনাথের আদিব্রাহ্মসমাজ ও মণ্ডলী,

* মহাভারত উদ্যোগ ভগবদ্যান ১৩৮ অধ্যায় ৩১৪ পৃঃ।

ক্রমে কেশবচন্দ্রের নববিধান, সর্ব্বশেষে শিবনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণের সাধারণসমাজের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কত দরজা দিয়া ব্রাহ্মসমাজে কত লোক প্রবেশ করিয়াছে। আমি অকুণ্ঠিতভাবে বলিতে পারি, "জাত ব্রাহ্ম" ছাড়া এই সমাজের সভ্যেরাই সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি করিয়াছেন। একমাত্র ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া সকলে আইসেন নাই। কেহ সমাজে স্থান না পাইয়া, কেহ বিলাত-ফেরত জাতনাশা হইয়া, কেহ স্ত্রীস্বাধীনতা দেখিয়া, কেহ সংস্কারক হইয়া, কেহ অনুন্নত সমাজ অবাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, কেহ বা সুখসাচ্ছন্দ্য ও সভ্যতার আকর্ষণে পড়িয়াই আসিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য —মুক্তির জন্য অতি অল্প লোকই আসিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজ তো এই সকলকে লইয়াই। সুতরাং দোষ দিব কাহার? কে শাসক—কে শাসিত? "পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে ঘৃণা করিও না" ধর্ম্মরাজ্যের বড় উপদেশ ইহা হইতে আর কি আছে? তবে বুঝিতে হইবে, ইহা ব্যক্তিগত ধর্ম্মাদর্শেরই কথা; সমাজ-সংস্থিতিতে এই বাণীর ব্যাখ্যা অন্যতর। কথা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়, ধর্ম্মসমাজ গড়িবার মালমসলা ও উপকরণ ঠিক রাখিয়া উচ্চ আদর্শে ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিতেই হইবে। ধর্ম্মসমাজ তাহারই নিয়মাধীন থাকিবে। ব্রাহ্ম-সমাজে এই নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল ও বিপর্য্যস্ত হইয়া বিপ্লবের সূচনা করিতেছে। সমাজ থাকিবে, শাসন থাকিবে না? এ কি কখনও সম্ভব ও তাতে কি মঙ্গল হয়?

এই জন্য শুভব্রত বাবুর প্রবন্ধের পোষকতায় কথা না বাড়াইয়া ইহাই তিন ব্রাহ্মসমাজের বিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের নিকটে নিবেদন যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেছেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশে প্রচার হইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাজ গড়িতেছে না। বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেরই অল্পবিস্তর দৃষ্টি পড়িয়াছে যে, আমরা সমাজশক্তিতে দিন দিন হীন, দুর্ব্বল ও মলিন হইয়া পড়িতেছি। ইহাই অশুভ লক্ষণ। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক শাসনে আনা একান্তই বাঞ্ছনীয়। ভয় করিলে চলিবে না, ইহা সত্য। "যে যায় যাক যে থাকে থাক, শুনিয়া চলি তাঁহারই ডাক।" সামাজিক শাসনের মূল সূত্র হইবে গ্রহণ সংশোধন ও উন্নয়ন। প্রেম ইহার মূল মন্ত্র, বর্জ্জন নহে। কিন্তু পাপের সঙ্গে সন্ধি করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে সাংসারিক প্রয়োজনের প্রভাবে উচ্চাসন প্রদান, ধর্ম্ম-সমাজের পক্ষে প্রেমের ও সম্মানের লক্ষণ হইবে না। ইহাতে বিচ্ছিন্নতা আসিলে—ভিন্ন দলের সৃষ্টি হইলে ভয়ের কারণ নাই, ইহাই "যৎকিঞ্চিতে"র শেষ কথা। ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা অনেক, কত আর বলিব? সমস্যার যথাসাধ্য সমাধানে দিন থাকিতে সকলে বদ্ধপরিকর হউন। যিনি যাহা স্বাধীনভাবে লিখুন না কেন, আমরা যেন তাহা অভিযোগ মনে করিয়া অথবা অমঙ্গল কল্পনা না করি। এ আলোচনায় সমাজের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিশ্বাস করি।

রাজা রামমোহন রায় ও অপবাদখণ্ডন।

তর্পণের ফল।

বর্ত্তমানে তর্পণের সময় চলিয়াছে। ভারতবর্ষের উপর দিয়া যে অসংখ্য দ্বন্দ্ববিপ্লব, অসংখ্য ঝড় ঝটিকা চলিয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। সেই দ্বন্দ্ববিপ্লবের মধ্যে, সেই ঝড়ঝটিকার মধ্যে কত মহাপুরুষ যে সমুত্থিত হইয়াছিলেন আর কত মহাপুরুষ যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। মহাপুরুষদিগকে ভারতবাসীরা অবতাররূপে দেখিতে ভালবাসিতেন—মহাপুরুষদিগের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতাররূপে উপলব্ধি করিতে ও গ্রহণ করিতে বড়ই তৃপ্তিলাভ করিতেন। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ"—অবতারের সংখ্যা নাই। ঐ অসংখ্য মহাপুরুষের ভিতর যাঁহারা গৌরবসমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আজ পর্য্যন্ত জাগিয়া আছেন, আজ তাঁহাদিগকে ভারতবাসী তর্পণ প্রভৃতি শতবিধ আকারে প্রকারে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছে। মহাপুরুষদিগের ন্যায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও যাহাতে প্রতি পদে প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, প্রত্যেক পর্ব্বাহে শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য লাভ করেন, আমাদের জীবনপরিচালনে তাহার ব্যবস্থা করা রহিয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থারই ফলে আমরা আজ সহস্র যুগযুগান্তরের পরেও ধর্ম্মবক্তা বশিষ্ঠ, গায়ত্রী মন্ত্রদ্রষ্টা বিশ্বামিত্র, আত্মার আত্মারূপে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সেই তত্ত্বপ্রকাশক শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষি এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতি আমাদের অন্তরে গাঁথিয়া রাখিতে সমর্থ হই।

পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা উন্নতির কারণ।

অধ্যাপক মোক্ষমুলর একস্থলে অতীব সত্য

কথা বলিয়াছেন যে, যে জাতি নিজের পূর্ব্ব স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অগ্রসর না হয়, সে জাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। যতদূর মনে পড়ে, আমাদের দেশকে উপলক্ষ্য করিয়াই তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন এবং এদেশের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণে ভারতের উন্নতির সম্ভাবনার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতই, যে দেশ যে জাতি পূর্ববর্তন মহাপুরুষ এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে না পারে, সে দেশ সে জাতি যে নিজেদের উন্নতির ধারাই রক্ষা করিতে পারে না—নিজেদের আদর্শই যে হারাইয়া ফেলে। আমাদের দেশে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের দেশে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আমাদের দেশে শত শত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আমাদের দেশে বুদ্ধ ও চৈতন্য, নানক ও কবীর প্রভৃতি শত শত সাধু মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই এই ভারতভূমি ধন্য হইয়াছে; তাই আমরা শত দুঃখদৈন্যের মধ্যেও এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমরা আপনাদিগকে ধন্য বোধ করি।

কি প্রকার জীবনচরিত অপাঠ্য।

যে সকল জীবনচরিত পাঠ করিলে আমাদের মন উন্নতির পরিবর্ত্তে অধোগতির দিকে যায়, বা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে, সেরূপ জীবনচরিত লেখাও লেখকের মূর্খতা এবং জীবনচরিত হিসাবে তাহা পাঠ করাও সময়ের, অর্থের এবং energyর অপব্যবহার মাত্র। ইংলণ্ড-রাজ চতুর্থ জর্জ্জের সমসাময়িক একটি ফুলবাবুরও জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু জীবনচরিত হিসাবে তাহা কেহ পড়িয়াছেন বা পড়িবেন কিনা জানি না।

জীবনচরিতে মক্ষিকাবৃত্তি।

জীবনচরিত লিখিতে গিয়া আমাদের মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিলে চলিবে না। মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি—মক্ষিকাসকল ভাল জিনিস ছাড়িয়া কোথায় কাহার দেহে ক্ষত আছে তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিয়া আহার্য্যরূপে ভোগ করিতে ভালবাসে। মহাপুরুষদের জীবনে কোথায় কখন্ ক্ষত হইয়াছিল, কখন্ তাঁহারা একবার মোহবশত অবনতির পথে নামিয়া গিয়াছিলেন, সেইগুলিই খুঁজিয়া খুঁজিয়া জীবন চরিতে সন্যস্ত করা আমার মতে সুলেখকের কার্য্য নহে।

রাজা রামমোহন রায়ের অপবাদখণ্ডন।

মহাপুরুষের নামে যে সকল অপবাদ উঠে, তাহার অধিকাংশই মিথ্যা; হয়তো সত্যের অতি সামান্য ভিত্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু সেই ভিত্তিটুকুকে সমুজ্জ্বল আকারে পাঠকসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহার উদ্দেশে চতুর্দিকে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহার নামে গোখাদক বলিয়া অপবাদ উঠিয়াছিল। এক্ষেত্রে কিছুমাত্র ভিত্তি না থাকিলেও অপবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন সকালে রাজা রামমোহন রায় পাঁউরুটি মধুসহযোগে খাইতেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কার্য্য উপলক্ষে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাওয়ায় রাজা তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখ আমি পাঁউরুটি ও মধু খাইতেছি, লোকে বলে আমি গোমাংস খাই।" সেইরূপ উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধেও তাঁহার অপবাদ আছে, ইহা তো জানা কথা। তাঁহার নানাকারণে শত্রুর বড় অভাব ছিল না, সুতরাং তাহাদের মুখে মুখে অপবাদ বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করাও কিছু আশ্চর্য্য নহে। ক্রমে, অনুপ্রাসমূলক শ্রুতিমধুর প্রবচন অবলম্বনে লোকের ধারণা হয় যে, "যাহা রটে, তাহার কিছু তো বটে"। এই সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, অপবাদটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সম্প্রতি নাকি তাঁহার উৎকোচগ্রহণ সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার স্বরূপ আমার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাও আলোচনা করিয়া আমার স্থির ধারণা হইয়াছে যে, সে প্রমাণ অমূলক। যদি উৎকোচ গ্রহণে তাঁহার অভ্যাস থাকিত, তবে তিনি এত অর্থসঞ্চয় করিতে পারিতেন যে, তাঁহার রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ পুত্রদ্বয়কে চাকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া

"রংপুরে রামমোহন রায়" নামক প্রবন্ধ "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তদানীন্তন কলেক্টর ডিগবি সাহেব রামমোহন রায়ের পদোন্নতি লইয়া Board of Revenueর সহিত নির্ভীকভাবে যে তর্কবিতর্ক চালাইয়াছিলেন এবং সেই তর্কবিতর্কে রামমোহন রায়ের "সাধুতা", "ফৌজদারী আদালতে সেরেস্তাদারের কার্য্য করিবার সময়েও ন্যায়পরায়ণতা" সম্বন্ধে যে প্রকার জোরের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়, তাহাতে তাঁহার উৎকোচ গ্রহণ কিছুতেই সমর্থিত হয় না, বরঞ্চ তাঁহার সমগ্র চরিত্রের প্রশংসাই দেখা যায়। রামমোহন রায়ের উৎকোচ গ্রহণ যদি অভ্যস্ত থাকিত তবে Board of Revenue সে বিষয়ে, খুব সাবধানতার সহিত হইলেও, ডিগবিকে কিছু না কিছু ইঙ্গিত করিতে নিরস্ত থাকিতে পারিতেন না।

মহাপুরুষের অপবাদ বৃথা প্রকাশ করা অনুচিত।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এমনও যদি হয় যে, তাঁহার চরিত্রে কোনও কলঙ্ক পড়িয়াছিল, তবে তাঁহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে তিনি সে সমস্ত কলঙ্ক নিঃশেষে ধুইয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন। যিনি যতবড়ই মহাপুরুষ হউন না কেন, তিনি মানুষ তো বটে—তিনি পূর্ণপুরুষ তো নন। সুতরাং তিনি যে সম্পূর্ণ দোষশূন্য সে কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব সেইখানে, যেখানে তিনি নিজের দোষ সকল ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুক্তির অভিমুখে ছুটিতে পারেন এবং অনুতপ্ত হৃদয়ের নবতর শ্রী ধারণ করিয়া ভগবানের চরণতলে উপস্থিত হইতে পারেন। কিন্তু এক সময়ে দোষ ছিল বা নাই ছিল, মহাপুরুষ সম্বন্ধে অপবাদ সমুজ্জ্বল আকারে প্রকাশ করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। এই সে দিন জনৈক পরিব্রাজক আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন যে, যে প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতেও নিষেধ করিয়াছেন—তাহা সঙ্গত বা অসঙ্গত এখানে বিচার করিতেছি না—'তিনিও যেখানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ আছে এবং তাহা অমুক পুঁথিতে লিখিত আছে'। তিনি সেই কথা প্রকাশ করিতে উদ্যত। আমি খুব দৃঢ়তার সহিত যখন তাঁহার সঙ্কল্পের অন্যায্যতা বুঝাইয়া দিলাম, তখন তিনি নিরস্ত হইলেন। দয়ার অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে নানা অপবাদ যে ছিল, তাহা কে না অবগত আছেন? মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি, ইহা মনে রাখিয়া মহাপুরুষদিগের অপবাদ ঘোষণা হইতে আমাদের যথাসাধ্য নিরস্ত থাকাই উচিত। তাঁহারা দোষ কাটাইয়া কিরূপে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য যেটুকু দোষ উল্লেখ না করিলে চলে না, সেইটুকু মাত্র দোষ, এবং তাহাও অত্যন্ত বিনয় ও দীনতা সহকারে, বলা যাইতে পারে।

স্মৃতি-তর্পণ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বর্ত্তমানে তর্পণ-পক্ষ চলিতেছে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় আচার্য্য ও উপাচার্য্যরূপে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিবার এই প্রশস্ত সময়। তাই ধারাবাহিকরূপে যতদূর সাধ্য তাঁহাদের নাম পর পর সন্নিবেশিত হইল; এবং তাঁহাদের দেহাবসানের সময় যাঁহাদের পাইয়াছি তাহাও লিখিত হইল।

১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাহার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেখিতে পাই যে মহাত্মা রাজা রামমোহন তাঁহার "মাণিকতলার উদ্যানগৃহে ১৭৩৭ শকে আত্মীয় সভা স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সে স্থান পরিবর্ত্তন হইয়া তাঁহার ষষ্ঠীতলার বাটীতে সভা হইত। তদনন্তর কতক দিবস তাঁহার সিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনর্ব্বার মাণিকতলার উদ্যানে আরম্ভ হইয়াছিল। সায়াহ্নকালে আত্মীয়সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত, কিন্তু বেদব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না। রাজার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন ও গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিতেন। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় তথায় সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতেন। আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বিদেশে তাঁহার আবাস-নিকেতনে একেশ্বরবাদ লইয়া ধর্ম্মালোচনা চলিত, কিন্তু রাজা ব্যতীত অন্যান্য যাঁহারা প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেন, তাঁহাদের নাম দুষ্প্রাপ্য। ১৭৫০ শকে ভাদ্রমাসে যোড়াসাঁকোস্থিত কমল বসুর বাটীতে উপাসনালয়

প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতি শনিবার সায়ংকালে সমাজ হইত। প্রথমতঃ দুইজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন, তদনন্তর উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান করিতেন পরিশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজের কার্য্য সমাপ্ত করিতেন। ঐ দুইজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণের নাম দুষ্প্রাপ্য এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিদায়গ্রহণ ও মৃত্যুকালের সন্ধান পাওয়া যায় না।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সমাজে যে সমস্ত ব্যাখ্যান দেন, অন্ততঃ তাহার প্রথমগুলি মহাত্মা রাজা রামমোহনের লিখিত এইরূপ অনেকের ধারণা, কিন্তু পরবর্ত্তী ব্যাখ্যানগুলি বিদ্যাবাগীশের নিজের রচিত। ১৭৬৫ শকের মাঘ ও ফাল্গুন মাহার পত্রিকায় বিদ্যাবাগীশের নামের সহিত আচার্য্য শব্দ অন্বিত দেখা যায়। রাজার বিলাত গমনের পর হইতে বিদ্যাবাগীশ অত্যাশ্চর্য্য ঐকান্তিকতার সহিত ব্রহ্মোপাসনার সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে লইয়া ব্রাহ্মণ্য তেজে ১৭৬৫ শকের মাঘ পর্য্যন্ত উহার সেবা করিয়া পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৭৬৬ শকের ২০এ ফাল্গুন প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হয়।

বিদ্যাবাগীশের জীবদ্দশায় ঈশ্বর ন্যায়রত্ন ও পরে শ্রীধর বিদ্যারত্ন (ন্যায়রত্ন) উপাচার্য্যরূপে সমাজের সেবা করিয়াছিলেন ; পরে শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশও উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আচার্য্য এবং শ্রীধর ন্যায়রত্নকে উপাচার্য্যরূপে অভিহিত করা হইত। তাঁহাদের মৃত্যুর তারিখের ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। পরে শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান মহারাজার অধীনে মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্যে ব্রতী হন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ অবিদিত। পরে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কাশী হইতে অধীতবিদ্য হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে নিযুক্ত হন। বেদান্তবাগীশ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুচারুরূপে সবিশেষ উদ্যমের সহিত সুসম্পন্ন করিয়া ১৭৯৭ শকের ১লা আশ্বিন তারিখে পরলোক গমন করেন। বাণেশ্বর কিছুদিন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতঅনুবাদে নিযুক্ত হন। বাণেশ্বরের বিদায় গ্রহণের পরে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে নিযুক্ত হন। উভয়েরই যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল এবং উভয়েই বাগ্মী ছিলেন। পাকড়াশী মহাশয় দিনকতকের জন্য ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ রহিত হয় এবং তিনি ১৭৯৫ শকের ১৬ই ভাদ্র তারিখে পরলোক গমন করেন। বাণেশ্বর বিদায় গ্রহণ করিলে বেদান্তবাগীশ ও বেচারাম এবং পাকড়াশী উপাসনা-কার্য্য চালাইতেন। পাকড়াশী ঢাকায় গমন করিলে বেদান্তবাগীশ ও বেচারাম উপাসনা কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। পরে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে মতভেদ হইলে কেশববাবু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বেদীগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে কেশববাবু আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। কেশব বাবুর মৃত্যু ১৮০৫ শকের ২৫এ পৌষ তারিখে ঘটে। অদম্যকর্ম্মী বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে আসিয়া পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরে কতকটা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়েন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। বিজয়কৃষ্ণের দেহান্ত সন ১৩০৬ সাল অর্থাৎ ১৮২৮ শকের ২০এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঘটে। অন্নদাপ্রসাদ মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর তারিখ জানিতে পারি নাই। ব্রাহ্মসমাজের অক্লান্ত ও আমরণসেবী বেচারাম ১৮০৮ শকের ১৮ই ভাদ্র তারিখে দেহত্যাগ করেন। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কয়েকদিন ধরিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিতেন না। তাঁহার মৃত্যু ১৮২৭ শকে সংঘটিত হয়। পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অনেক দিন আদিব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য থাকিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের গঠনমূলক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ১৮২৬ শকে ৬ই মাঘ তারিখে মহাপ্রয়াণে যাত্রা করেন। আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে কেশববাবু প্রমুখ বিদায় গ্রহণ করিলে মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মধ্যে মধ্যে তাঁহার দেহ ভগ্ন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অল্পদিনের জন্য আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার চিরবিদায়ের দিন ১৮২০ শক ২রা আশ্বিন। বেদান্তবাগীশের জীবদ্দশায় পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন একবার আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হন। পরে তিনি আবার কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত হন। বেদান্তবাগীশের মৃত্যু হইলে বিদ্যারত্ন আবার আদিসমাজে মিলিত হইয়া আমরণকাল উহার আচার্য্যরূপে ব্রতী হন। তাঁহার মৃত্যু ১৮২৮ শকের ২৪শে অগ্রহায়ণ। মহর্ষির প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মধ্যে মধ্যে আদিব্রাহ্মসমাজের বেদীগ্রহণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যু ১৮৩৩ শকের ১৮ই কার্ত্তিক ঘটে। আমরা ইতিপূর্ব্বে শম্ভুনাথ গড়গড়ির উল্লেখ করি নাই। বেদান্তবাগীশের মৃত্যুর পর হইতে তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকার্য্য আমরণ বেচারাম বাবুর সহিত চালাইতেন। তাঁহার মৃত্যু ১৮২৮ শকের

২রা মাঘ। মহর্ষির মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যারত্নের গড়গড়ির ও শাস্ত্রীর তিরোভাব। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার শেষ বয়সে মধ্যে মধ্যে কয়েকদিনমাত্র আদিব্রাহ্ম-সমাজের বেদী গ্রহণ করিতেন। তাঁহার দেহান্ত ১৮৩৫ শকের ১লা আষাঢ় ঘটে। হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি মধ্যে মধ্যে বেদীতে বসিতেন। ইতিপূর্ব্বে দীননাথ অধ্যেত্তা নামে জনৈক উৎসাহী অন্ধ প্রচারক বহু দিন ধরিয়া প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার মৃত্যুদিন সন ১৩০৩, ৯ই মাঘ। স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু যিনি কখনও বেদীর কার্য্য করেন নাই অথচ ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য যে অমূল্য দান তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তর্পণপক্ষে তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তির অঞ্জলি গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকারী। পরম শ্রদ্ধেয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অনেকদিন ধরিয়া নিয়মিতরূপে বিশেষ যোগ্যতার সহিত বেদীর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়া-আসিয়াছেন। তিনি ১৮৪৪ শকে ২৪শে পৌষ তারিখে অন্তর্দ্ধান হন। পরে ১৮৪৭ শকের ৪ঠা মাঘ তারিখে পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গৌরব বিশেষভাবে প্রবর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীর কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতা ও সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে তড়িতের ন্যায় শক্তি সঞ্চার করিত। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ অনেকদিন ধরিয়া মধ্যে মধ্যে বেদীর কার্য্য ও নিয়মিতরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ আচার্য্যরূপে বেদীর কার্য্য চালাইতে-ছেন। চিন্তামণি বাবুর আচার্য্যরূপে কার্য্যকালের পরিমাণ ৪৩ বৎসর কাল। আমরা যে কয়েকজন জীবিত আছি তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহাদের অমর আত্মা ব্রাহ্মসমাজের মধ্য হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে তাঁহারা সকলে আমাদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-বারিতে "তৃপ্যন্তু"—তৃপ্তিলাভ করুন, সাশ্রুনয়নে ইহাই আমাদের কামনা।

—

মহদ্বাণী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ)

ভগবদ্জ্ঞানে সকলই স্বপ্রকাশ—সকল সত্তাই তাঁহার জ্ঞানে বিনা কালের ব্যবধানে একসঙ্গেই সুপ্রকাশ; তাঁহার নিকট কিছুই লুক্কায়িত নাই।

দেশাতির—জোরোস্ত্।

ভগবান আদি জ্ঞান—তুমি আদি মহাজ্ঞান! তোমার জ্যোতি সকল জ্যোতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। তোমারই জ্ঞানে জগত চরাচরের উৎপত্তি। তুমিই ধর্ম্ম, নীতি ও সাধুভাবের সংরক্ষক। তুমিই পরমাত্মা। তুমি চিরকাল একই আছ।

যশ্ন—জোরোস্ত্।

ভগবদ্জ্ঞানে সকল তত্ত্ব উন্মুক্ত—তাঁহার নিকটে সকল রহস্যই উন্মুক্ত। তিনি ব্যতীত অপর কেহই সেগুলির তত্ত্ব অবগত নহে। শুষ্ক ভূমির উপর যাহা কিছু আছে এবং সাগরগর্ভে যাহা আছে, তিনি সকলই জানেন। তাঁহার জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া একটী বৃক্ষপত্রও পতিত হয় না। পৃথিবীর অন্ধতম প্রদেশে একটী শস্য নাই, একটী শ্যামল শষ্প নাই বা একটী জীর্ণ শুষ্ক বস্তু নাই, যাহা তাঁহার উজ্জ্বল জ্ঞানে প্রকাশিত নাই।

কোরাণ।

ব্রহ্মচর্য্য—অবারিত উদ্যম, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, উন্মুক্ত নির্ম্মল ও উদার মন, প্রাণময়ী চিন্তা ও জ্যোতির্ম্ময়ী কল্পনা—এসবের উপরে যদি কিছু থাকে ত আমার বিশ্বাস—সে হ'চ্ছে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য। এই এক ব্রহ্মচর্য্যের বলেই একদিন আমাদের এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি অতি সহজে এমন অনায়াসে, স্বাভাবিক শক্তিবলে এ বিশ্বসংসারে জগদ্গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। আর আজ যদিও সে পদানত, নির্জ্জীব, অসহায় ও নিঃস্ব, তবু ঐ একটী মাত্র উপায় অবলম্বনকল্পে এখনও সে নিশ্চয়ই আবার সেই শূন্য সিংহাসনে গিয়ে ধীরে ধীরে উপবেশন কর্ত্তে পারবে। আমি সেই শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে বসে আছি। আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি—যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদের হেয় ও নগণ্য ভেবে উপেক্ষা করুক না,—আমরা আবার জাগব, মনুষ্য হব। এ আঁধার চিরদিন কখনও আমাদের ছেয়ে থাকবে না, থাকতে পারে না। এ স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, অযথা প্রলাপ বা শূন্য অহঙ্কার নয়। "আসিবে সে দিন আসিবে।" আমি চাই শুধু ঐ বীর্য্য-বল—ব্রহ্মচর্য্য; চাই শুধু ঐ সত্যনিষ্ঠা; চাই শুধু আসল, খাঁটী, ধ্রুব ও নিটোল ধর্ম্মবল, আর ঐ এক কথায়—মনুষ্যত্ব।

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—কুরুক্ষেত্রে উদ্ধৃত)

কর্ম্ম ও ভগবানে নির্ভর—ভগবান আমাদিগের হস্তে যে সমস্ত কর্ম্মের ভার দেন, সেগুলি খুব সোজাভাবে ও ধীরভাবে করিলেই তিনি নিশ্চয়ই তাহার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন। আপনাকে শান্ত রাখিবে এবং ঈশ্বরে নির্ভর করিবে; তিনি তোমার চিন্তার বোঝা

লঘু করিয়া দিবেন। প্রত্যেক বিষয়েই যতদূর সম্ভব সরল ও স্বাভাবিক পথে চলিও। সত্য যে সত্য এবং মিথ্যা যে মিথ্যা, তাহা খুব স্পষ্টরূপে দেখিবার চেষ্টা কোরো।

এইচ—মনসেল।

মানবের মহান ও গৌরবপূর্ণ অধিকার হইতেছে একটা উদ্দেশ্য ধরিয়া বাঁচিতে জানা; এই অধিকারের নিকট আর যাহা কিছু—রাজত্ব করা, অর্থসঞ্চয় করা, গৃহনির্ম্মাণ করা—সে সমস্তকে খুব বেশী ধরিলেও মাত্র ছোটখাটো "যোগান" appendices ও চাড়া দিবার খোঁটা বলা যাইতে পারে।

মঁতাইন্ (Montaigne)

নানাকথা।

তরুণ সাহিত্য—গত ৭ আশ্বিন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে অভ্যর্থনা করা হয়। তদুপলক্ষে তিনি প্রকারান্তরে অশ্লীল সাহিত্যের প্রতিবাদে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। তিনি বলেন—"সেই (তরুণ) সাহিত্যের মধ্যে বারম্বার কেবল কামনা-সূচক বিষয় প্রকাশ হইতেছে। আধুনিক তরুণ সাহিত্য সংযমের সীমা বহুদূর লংঘন করিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে সাহিত্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধোগতি ঘটিতেছে।" একটী কথা আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেন যে, একবার কোন বন্ধুর গৃহে প্রায় ২০টী তরুণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সমস্ত তরুণী তাঁহাকে বলেন যে, বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্য পড়িয়া তাঁহারা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করেন এবং নিজেদের লিখিবার শক্তি থাকিলে এই সাহিত্যের যথোচিত প্রতিবাদ করিতেন; কিন্তু তাহাতে নিরর্থক গোলমাল বাধিতে পারে বলিয়া তরুণীগণ শরৎ বাবুকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তাঁহাদের পক্ষ হইতে তরুণ সাহিত্যিকদিগের নিকট এই প্রতিবাদবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন এবং জানাইয়া দেন যে, বাঙ্গলার রমণীসমাজ বর্ত্তমান তরুণ গল্পসাহিত্যের জন্য লজ্জিত"। (আনন্দবাজার ৮ আশ্বিন ১৩৩৬) ইহার উপর আমাদের টীকা নিষ্প্রয়োজন।

তরুণের মতিগতি—কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, আজকালকার তরুণগণ শরৎবাবুর এই উপদেশ গ্রহণ করিবেন কি? আজ কয়েক দিন হইল, এক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, একখানি সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে ধারাবাহিকরূপে একটা অতি অশ্লীল উপন্যাস বাহির হইতেছিল। সেই উপন্যাসের কারণে উহা যে কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কয়েক সংখ্যাই নাকি অতি অল্পকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল! আরও এত যুবক সেই কয়েক সংখ্যা পাইবার জন্য লালায়িত হইলেন যে, শুনিলাম নিতান্ত অসম্ভব না হইলে সেই মাসিকপত্রের মালিক ঐ কয়েক সংখ্যা পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ করিবেন!

বাল্যবিবাহ বিরোধ আইন—এই আইন সেদিন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কন্যার পক্ষে বিবাহের ন্যূনকল্পে বয়স ১৪ বৎসরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বলা বাহুল্য আমরা যৌবনবিবাহই সমর্থন করি। আমরা বিশ্বাস করি যে শাস্ত্রে যৌবন বিবাহই সমর্থিত হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৩২৯ সালের (১৮৪৪ শকের) ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছি। যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা" গ্রন্থে এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন। তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, মনুসংহিতার মতে উত্তম কল্প এই যে, অন্যূন ত্রিংশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ষোড়শ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে। রঘুনন্দনের মতে ২০ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ১৬ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিলেই মঙ্গল। সুশ্রুত বলিয়াছেন—২৫ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক পুরুষের অপ্রাপ্তষোড়শ বর্ষীয়া কন্যাতে পুত্রোৎপাদন কর্ত্তব্য নহে। তবেই পুরুষের পক্ষে ২০ হইতে ৩০এর মধ্যে বয়সই বিবাহযোগ্য এবং কন্যার পক্ষে চিন্তাশীল ও প্রামাণ্য শাস্ত্রকারের মতে ন্যূনকল্পে বিবাহযোগ্য বয়স ১৬ বৎসর। "নগ্নিকা" শব্দ হইয়া অনেকে শিশুবিবাহ সমর্থন করেন। কিন্তু আসলে ইহা "অনৃতুমতী" অর্থের একটী পারিভাষিক শব্দ। নচেৎ মহাভারতে "ত্রিংশবর্ষীয় পুরুষ ষোড়শবর্ষীয়া 'নগ্নিকা' কন্যাকে ভার্য্যা করিবার কথা থাকিত না। তন্ত্রশাস্ত্রেও যৌবনবিবাহ সমর্থিত না হইলে আমরা উহাতে পিতার প্রতি "অজ্ঞাত-পতিমর্য্যাদা, অজ্ঞাতপতিসেবনা ও অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনা 'বালিকাকে' বিবাহ দিতে নিষেধবিধি" দেখিতাম না।

যাক, যৌবন বিবাহ যেমন শাস্ত্রেও সমর্থিত হইয়াছে, আমরাও তেমনি উহা সমর্থন করি। কিন্তু আইনের সাহায্যে সমাজসংস্কারের আমরা পক্ষপাতী নহি। সতীদাহ নিবারণের দৃষ্টান্ত প্রতিপদে আইনের দ্বারা

সমাজসংস্কারের অনুকূলে উল্লিখিত হইতেছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দেওয়া সঙ্গত নহে। আমাদের মতে সতীদাহ প্রভৃতি যে সকল প্রথার ফলে প্রতিপদেই নরহত্যার সম্ভাবনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, অথবা দেবদাসী বা পতিতাদিগের কর্ত্তৃক শিশু বালিকাক্রয় প্রভৃতি প্রথার ফলে সমাজে ভীষণ দুর্নীতি অনিবার্য্য হইয়া উঠে, সেই সকল প্রথাই আইনের দ্বারা উঠাইয়া দাও বা সংস্কার কর। কিন্তু সাধারণত লোকাচার, দেশাচার, বিশেষত ধর্ম্মানুষ্ঠানসকল আইনের দ্বারা সংস্কার করিতে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত মনে করি না। আজ তোমরা যে কারণে হউক বা যে উপায়ে হউক ভোট বেশী পাইলে বলিয়া এই আইন পাশ করাইতে পারিলে; কিন্তু কাল যদি বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী সম্প্রদায় বেশী ভোট পান, তবে তাঁহারা তোমাদের এই আইন মুহূর্ত্তের মধ্যে উলটাইয়া দিতে পারিবেন। আইনের দ্বারা সমাজসংস্কার করাইতে চাহিলে এইরূপই চলা সম্ভব। তারপর, গবর্ণমেন্টের মনোনীত সভ্য, বিশেষত ইংরাজদিগকে এবিষয়ে ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া দূরদর্শিতার কার্য্য হয় নাই। লোকে বুঝিবে ও বুঝাইবে—এখনই তো ঐ ভাবে বুঝানো হইতেছে—যে, গভর্ণমেণ্ট চান এইরূপ আইনের ফলে হিন্দুমুসলমানের ধর্ম্মনাশ করিয়া কলহ বিবাদের সৃষ্টি করিতে। গবর্ণমেণ্ট বলিবেন—এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; কিন্তু তাঁহাদের একথা শুনিবে কে? কেবল নির্ব্বাচিত সভ্যের আধিক্যে প্রস্তাবটী গৃহীত হইলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথাই উঠিতে পারিত না। তার পর, ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্র ভারতবাসী পবিত্রদৃষ্টিতে পুণ্যপত্ররূপে দেখে, কারণ উহাতে এদেশবাসীর ধর্ম্মবিষয়ে ইংরাজরাজের নিরপেক্ষ থাকিবার কথা আছে। কিন্তু এই আইন পাশ হইবার পর সে বিশ্বাস কি অটুট থাকিবে? যিনি যতই বলুন, আমরা জানি যে, পল্লীগ্রামে এখনও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রাধান্য বজায় আছে। যতদূর জানি, তাহাতে জোরের সঙ্গে বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই আইনে বিশেষ আঘাত পাইয়াছেন এবং যতদিন এই আইন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন ক্রমাগত আঘাত পাইতে থাকিবেন। তাহার ফল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শুভজনক হইবে বলিয়া মনে হয় না। তারপর, সে দিন টাউনহলের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এই আইনের বিরুদ্ধে সভা আহূত হইয়াছিল—সেই সভায় মহারাজা বাহাদুরকে অপমানিত করিয়া সভাভঙ্গের ব্যবস্থা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, ঠিক ন্যায়ের উপর আইনপক্ষপাতী সম্প্রদায় চলেন নাই, বরঞ্চ যাহাতে বিলের বিরোধী দল নিজের মত প্রকাশ করিতে না পারেন তাহারই বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয়, গবর্ণমেণ্টের কাণে দেশের ঠিক মতটী পৌঁছায় নাই।

পূর্ণিমাবিরহিত মাস—গত ১০ই আশ্বিনের সঞ্জীবনীতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ণিমা দেখা যায় নাই—জানুয়ারীতে ২বার এবং মার্চ্চে ২বার পূর্ণিমা হইয়াছিল। আগামী ২৫০০০ বৎসরের পূর্ব্বে এমন মাস নাকি আসিবে না।

যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মবলি—একটা আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য পলে পলে তিলে তিলে আত্মবলিদান করা কতদূর মহত্ত্বের পরিচায়ক, যাঁহারা আত্মবলিদানের পথে এতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সেই মহত্ত্বের জন্য, আদর্শের চরণে, ভগবানের হস্তে ফলাফলের ভার সন্ন্যস্ত করিয়া আত্মবলিদানের জন্য আমরা তাঁহার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি। যে পিতার ঔরসে এবং যে জননীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে পিতামাতা কৃতার্থ হইয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু ধর্ম্মরক্ষার জন্য রাজপুতরমণীর অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই যে গবর্ণমেণ্ট অনশনব্রতের অবসর দিতেছেন, ইহার ফলে বলিতে গেলে, তাঁহারাই দিকে দিকে ইহার বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভের পরোক্ষভাবে সহায়তা করিতেছেন। আমরা আশঙ্কা করি, ইহার অপরিহার্য্য পরিণামে চারিদিকে বৈপ্লবিক ভাবের বিষবীজ বা রোপিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি—যেখানে সেখানে দেখি যে, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আঁকিলেই তাঁহাকে একখানি পাড়ওয়ালা ধুতি বাঙ্গালী ধরণে পরাইয়া, কোমরে একটা চন্দ্রহার আঁটিয়া দিয়া, বস্ত্রহীন গাত্রে একটা চওড়াপাড়ওয়ালা চাদর ঝুলাইয়া, কণ্ঠে বাঙ্গালী বালকের মত কতকগুলি হার ঝুলাইয়া হাতে তরুণীদের উপযুক্ত "বালা" প্রভৃতি পরাইয়া আঁকা হয়। বাঁশীটী এমনভাবে মুখের কাছে ধরা হয় যেন, উহা ঠিক ঠোঁটের বাহিরে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ স্ত্রীলোক ও বালকের মত আঁকিতে শিল্পীদের কিরূপে অভিরুচি হয় বুঝিতে পারি না। মহাভারতের মত diplomat শ্রীকৃষ্ণ কি এই শ্রীকৃষ্ণ? আমরা নিজেরাও যেমন মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িতেছি, আমাদের দেবতাদিগকেও সেইরূপ মনুষ্যত্বহীন বলহীন আকার দিতে লজ্জা করি না, কুণ্ঠাবোধ করি না।

পত্র।

(কুরুবংশের দায়াধিকার সম্বন্ধে)

To the Editor of the

"TATTVABODHINI PATRICA"

Sir,

I have neither time nor inclination to take part in the controversy to which you have opened the columns of the Tattabodhini Patrica regarding the so-called legal claim of Duryodhana to the throne of Indra prastha. May I, in this connexion, draw the attention of the gentleman who initiated the controversy to the following passage Kautliya, I. 6.

"The two kings, Ravana and Duryodhana, came to grief for their sins, the one for not restoring another man's wife out of overweening pride and the other for not restoring another man's legal share of the kingdom." This passege speaks for itself, Comment is superfluous.

Yours etc.
N. Mukerjee.

—

শোক-সংবাদ।

৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—গত ২৯শে শ্রাবণ বুধবার অপরাহ্ণ ৩-১০ ঘটিকায় ৺শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্যতম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৯নং ফার্ণ রোডে তদীয় বালিগঞ্জস্থ বাসভবনে অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইয়াছিল; এবং পরিণত বয়সে ইনি বহু কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটকাদি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ সবুজপত্রে ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার কয়েকটী সুলিখিত প্রবন্ধ সত্বরই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই উদীয়মান সাহিত্যিকের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। ভগবান ইঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের শোকাপনোদন পূর্ব্বক লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

—

সংবাদ।

৺রাজা রামমোহন রায়—গত ১১ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নবনবতিতম সাম্বৎসরিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে কলিকাতার 'রামমোহন লাইব্রেরী-হলে' ও 'এলবার্ট-হলে' স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। রামমোহন-হলে সভানেত্রী-পদে বৃত হইয়াছিলেন শ্রীযুক্তা সরলা দেবী। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে রাজার মহনীয় চরিত্রের আলোচনা ও উল্লেখ পূর্ব্বক বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ "রাজা রামমোহন রায়" সম্বন্ধে যে নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, উহা মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল। আমরাও পাঠকগণের অবগতির জন্য পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় উহা প্রকাশ করিলাম।

৺শিবনাথ শাস্ত্রী—গত ১৪ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) সোমবার সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে অধ্যক্ষ শ্রীহেরম্বনাথ মৈত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের বহু খ্যাতনামা সেবক ও উপদেশক আচার্য্য শিবনাথের মহনীয় চরিত্রের আলোচনা ও উল্লেখ পূর্ব্বক বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতাটী সর্ব্বসাধারণের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। তিনি শাস্ত্রীমহাশয়ের সংস্কৃত ভাষার সহায়তায় উপাসনানির্ব্বাহের এবং দৈনিক উপাসনার প্রয়োজনের যে অমূল্য অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের ভাবিয়া দেখা উচিত।

—

আর্য্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা।

(সমালোচনা)

বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ মহাশয় তাঁহার সাহিত্য-সাধন-কুঞ্জে বসিয়া বিভিন্ন চিন্তা-তরঙ্গপ্রসূত বিভিন্ন কুসুমমাল্য সযত্নে গাঁথিয়া বঙ্গ-বীণাপাণির অঙ্গ সাজাইয়া দিতেছেন। এই "আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা" গ্রন্থও তাঁহার সযত্নে গ্রথিত সুরভি পুষ্পদাম বিশেষ। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত; উত্তম বাঁধাই পাঁচখানি সুন্দর ফটোচিত্র সমন্বিত; মূল্য এক টাকা বারো আনা। প্রাপ্তিস্থান,—৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো কলিকাতা। তিনি এই গ্রন্থের বহু স্থলেই যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির, অবস্থাতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণের এবং নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই বহু স্থলেই অতীব প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়,—রমণীর মাতৃত্ব; মনুসংহিতা ও মাতৃভাব; রমণীর ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা; শাস্ত্রে রমণীর অবরোধপ্রথা; শাস্ত্রে যৌবন-বিবাহ; স্ত্রীশিক্ষায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ; শাস্ত্রে রমণীর উচ্চ শিক্ষা; রক্ষণশীল ও অত্যুদার সম্প্রদায়; নব্যবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত ও রাজা রামমোহন রায়; বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা; গৃহ অনুষ্ঠানে স্ত্রী-স্বাধীনতা; বিবাহে স্ত্রী-স্বাধীনতা; পাশ্চাত্য বিবাহে অনুরাগপ্রভাব; সহব্রতে স্ত্রীশিক্ষা; একান্নবর্ত্তিতার অনুপযোগিতা; ব্যভিচার ও তাহার ঔষধ; বঙ্গরমণীর বর্ত্তমান পরিচ্ছদ; ব্রতাদিতে স্ত্রীশিক্ষা এবং সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি। সকল স্থলে ইঁহার অভিমতের সহিত আমরা একমত নহি; ইহা হওয়াও সম্ভবপর নহে; তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য যে, "বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা" প্রসঙ্গে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী এবং ইহার মর্ম্মান্তিক পরিণাম সম্বন্ধে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় এবং অকুণ্ঠিতভাবে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত একমত হইতে পারেন না, এমন চিন্তাশীলের সংখ্যা এক্ষণে অত্যন্ত বিরল হওয়াই প্রার্থনীয়। স্বর্গীয় স্বনামপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অধুনাতন শিক্ষাপ্রথা সম্বন্ধে যে সকল বহুমূল্য সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন,—সমালোচ্য গ্রন্থপাঠকালে সে সকল সিদ্ধান্তবাণীও প্রোজ্জ্বলভাবে পাঠকের চিত্তে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। ইদানীং এদেশে এক শ্রেণীর সংস্কারবাগীশের অভ্যুত্থান হইয়াছে; ইঁহারা এদেশীয় স্ত্রীলোকগণকে উচ্চশিক্ষিতা এবং উচ্চপদভূষিতা দেখিতে পাওয়াই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছেন; আজ এদেশে রমণী কাউন্সিলার, রমণী মাজিষ্টর, রমণী ব্যারিষ্টার, রমণী ডাক্তার ইত্যাদি ইত্যাদি দেখিয়া এই শ্রেণীর উন্নতিকামীগণ মনে করিতেছেন,—ভারতোদ্ধারের আর অধিক বিলম্ব নাই; কিন্তু এই সব "উন্নতির" পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ এবং বিষময়, তাহা আমরা বহুবারই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং সমালোচ্য গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র বাবুও তাহা বিশদভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁহার এই গ্রন্থের "বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা" পরিচ্ছেদ অবশ্যপাঠ্য এবং বিশেষ আলোচ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহার অল্পাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই পাঠক এই গ্রন্থকারের চিন্তাপ্রণালীর বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন,—"এই শিক্ষাপ্রণালীর ফলে আমাদের দেশে 'পাস' রোগ নামক একটী দুঃসাধ্য রোগ বিলাত হইতে আমদানী হইয়া দেশের বল ও তেজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। এই 'পাস' রোগের অত্যাচারে ছাত্রীদিগের দেহমন জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তবুও পিতামাতারা যে ইহা হইতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহাদেরও যে ইহাতে সম্পূর্ণ দোষ তাহা বলিতে পারি না। যেমন পৃথিবীতে ইন-ফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগসকল কালবশে আসে এবং কেহই সহজে তাহাদের হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ বর্ত্তমানকালে এই পাসরোগ অসিয়াছে —ধর্ম্মের বল, মনের দৃঢ়তা না থাকিলে ইহার হাত এড়ায় কাহার সাধ্য? কিন্তু আর ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; অনিষ্ট যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন ধর্ম্মসহায় হইয়া, ঋষিবাক্য অনুসরণ করিয়া ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বহুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা রমণীগণের অধিকাংশই সরলভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা পরীক্ষার জন্য বহুক্ষণ ঝুঁকিয়া অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হয়েন এবং প্রচলিত সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ, সুতরাং উপহাসের কারণ ভাবিয়া কোন প্রকার শারীরিক ব্যায়াম করিতে চান না। আমরা ভাবিতাম যে, কেবল আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীবিদ্যালয়েরই বুঝি এই ফল ফলিয়াছে। এখন দেখিতেছি তাহা নহে, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্ত্রীশিক্ষার ইহাই সর্ব্বভৌমিক ফল। হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার 'শিক্ষা' পুস্তকে পাশ্চাত্য স্ত্রীবিদ্যালয়ের এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া তাহার ফল বলিতেছেন। 'দুর্ব্বলতা, পাণ্ডুবর্ণ, স্ফুর্ত্তির অভাব এবং সাধারণত অস্বাস্থ্য'। কেবল ইহাই নহে, তিনি আরও বলেন যে, বৎসর দুই

বিদ্যালয়ে থাকিলেই এই সুন্দর শিক্ষাপ্রণালীর পেষণযন্ত্রে পড়িয়া "শতকরা এক শতজন কুব্জ হইয়া পড়ে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে।"

"গৃহ্য অনুষ্ঠানে স্ত্রীস্বাধীনতা," "সহবতে স্ত্রীশিক্ষা" এবং "পরিচ্ছদে স্ত্রীশিক্ষা" বিষয়ক পরিচ্ছেদসমূহ যত্নের সহিত পাঠ্য এবং আলোচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহঁার সকল অভিমতের সহিত আমরা একমত নহি; উদাহরণ স্বরূপ ইহাঁর আলোচিত পঞ্চদশ আলোচনায় 'শিশুবোধকের নির্ব্বাসন' প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতে পারি। ইনি ২০৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তকের অর্থাৎ (শিশুবোধকের) অন্তর্গত সরস্বতীর বন্দনা, কড়াকিয়া, শতকিয়া প্রভৃতি, কলঙ্ক-ভঞ্জন প্রভৃতি শিশুদিগের অপাঠ্য গল্প, চাণক্যশ্লোক, এ সকলের দ্বারা বালকের মনুষ্যত্ব বা বালিকার মাতৃত্ব বর্দ্ধিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই, বরঞ্চ এই সকল যে কত শত বালক-বালিকাকে ব্রহ্মচর্য্যের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহার হয়ত সংখ্যা হয় না।" ক্ষিতীন্দ্র বাবুকে এরূপ সুতীব্র ভাবে 'শিশুবোধক' সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। এক সময়ে এই 'শিশুবোধক'ই এদেশের সহস্র সহস্র বালককে 'মনুষ্যত্বের' এবং সহস্র সহস্র বালিকাকে 'মনুষ্যত্বের' পথে (অবশ্য এরূপ অবাধ স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন যদি তখন থাকিত) প্রবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছে বা করিতে পারিত। 'কলঙ্ক-ভঞ্জনে' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রধান আরাধিকা শ্রীরাধিকার সহস্রচ্ছিদ্র কুম্ভে জল আনয়ন পূর্ব্বক সতীত্বের প্রমাণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কি বালিকার 'মাতৃত্ব' অভিব্যক্তির শীর্ষস্থানীয় হইতে পারে না? বহুবিধ পুরাণ,—বিশেষত 'গরুড়-পুরাণ' নামক অত্যুৎকৃষ্ট এবং অতি মহিমামণ্ডিত মহাপুরাণের 'নীতি-সার' নামক প্রকৃষ্ট অংশ হইতে নির্ব্বাচিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক অষ্টোত্তর শত নীতিশ্লোকসমূহ কি বালকগণের 'মনুষ্যত্ব' বৃদ্ধির অত্যুত্তম সহায়ক হইতে পারে না? ইহার এক একটি শ্লোক যে অমূল্য। এই এক একটি শ্লোকই মুখস্থ এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তখনকার কালে শত শত ব্যক্তি সম্মানভাজন সামাজিক এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিতস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু এই পরিণত বয়সে শিশুবোধকের 'চাণক্যশ্লোক' গুলি পুনরায় নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। "গঙ্গা-বন্দনা" এবং "গুরুদক্ষিণা"—এই দুইটি উপাখ্যানও আর একবার তত্ত্বদৃষ্টিতে তিনি পড়িয়া দেখুন। শিশুবোধক যদি রুচিসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে ত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর—গোপাল উড়ের টপ্পা, নিধু বাবুর টপ্পা, কবিওয়ালাদের বিরহ এবং সখীসংবাদ প্রভৃতি গান সবই বঙ্গসাহিত্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন করিতে হয়! তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল সমালোচকের পক্ষে এমন ভাবে প্রাচীন পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে তীব্র প্রতিকূল সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের পূর্ব্বে তাঁহার সকল দিক বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখা অবশ্য বাঞ্ছনীয় ছিল না কি? অন্যত্রও স্থানে স্থানে তাঁহার সহিত আমরা একমত নহি। যেমন—"বেদাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা এবং ওঙ্কার উচ্চারণাদি" সম্বন্ধে স্ত্রীলোকগণের অধিকার বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য। অধিকারবাদ সম্বন্ধে এক্ষণে বহু পাশ্চাত্য মনীষীই অনুকূল মত প্রকাশ করিতেছেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু কি অধিকারবাদ একেবারেই অস্বীকার করিতে পারেন? তিনি বহু স্থলেই "বৈদিক কাল" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। "বৈদিক কালের" অর্থ কি? শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দু সন্তান মাত্রেরই পক্ষে এক্ষণও কি "বৈদিক কাল" নহে? যদি তিনি বলেন,—"বেদের প্রচলন এবং সভ্যতা যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল",—তাহা হইলেও আমরা বলিব,—বঙ্গে এক্ষণে চতুর্ব্বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপন পূর্ব্ববৎ বহুল নহে বলিয়া ভারতের অন্যত্র কি বেদের বহুল পঠন পাঠন এখনও পূর্ণ প্রবর্ত্তিত নহে? বঙ্গেও কি এক্ষণে বৈদিক বিধানমূলক সংস্কারসমূহ পূর্ণপ্রবর্ত্তিত নহে? হিন্দুর নিকট বেদ অপৌরুষেয় সনাতন। হিন্দুর নিকট চিরকালই "বৈদিক কাল"। এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য লেখকগণের অনুকরণে অধুনা এদেশের কেহ কেহ এইরূপ বৈদিক কাল" "বৈদিক-সভ্যতা" এবং "ঔপনিষদিক সভ্যতা" প্রভৃতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁদের বিশেষরূপ ভাবিয়া দেখিয়া এরূপ শব্দের প্রয়োগ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" এই শ্লোকার্দ্ধের "শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" এ সম্বন্ধেও আমাদের বলিবার কথা বিস্তর। প্রসঙ্গত "প্রতিভা দেবীর" কথা বলিতে গিয়া গ্রন্থকার মহাশয় যেন একটু অধিক মাত্রায় বলিয়া ফেলিয়া গ্রন্থের এই অংশে একটু ব্যক্তিগত অপ্রাসঙ্গিকতা আবির্ভূত করিয়াছেন। এইরূপ এবং আরও স্থানে স্থানে অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতবৈষম্য থাকিলেও আমরা অবিসম্বাদিত ভাবেই বলিব যে, তিনি এই গ্রন্থে যথেষ্ট চিন্তাশীলতা, অন্তর্দৃষ্টিশীলতা, বস্তুবিশ্লেষণপটুতা, নিরপেক্ষতা এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন। চিন্তাশীল সমাজহিতৈষিগণের নিকট এই পুস্তকের বহুল আলোচনা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

—বঙ্গবাসী, ১৯শে আশ্বিন ১৩৩৬।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা
১০৩৫

১৮৫১ শক
কার্ত্তিক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

মাতৃমঙ্গল।

১। ক্ষমাপ্রার্থনা।

জননী আমার! যখনই ভাবি, তখনই আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে যে, তুমি আমার কি স্নেহময়ী মাতা এবং তোমার কাছ থেকে আমি কিপ্রকার দীর্ঘকাল দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। দূরেতে যখন তোমার এতটুকু আভাস পাইয়াছি, তখনই আমি বিপথে কুপথে পলাইয়া বেড়াইয়াছি, পাছে তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আমাকে স্নেহচুম্বনে ঢাকিয়া ফেল। কণ্টকের বিষময় আঘাতে আমার মন ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, হায়-রে মূর্খ আমি, তবু তোমার কাছে ধরা দিতে চাহি নাই। মা জননী! আমার পাপের কথা বলিয়া আর শান্তি পাইতেছি না—অশান্তির অগ্নিতে সমস্ত প্রাণটা জ্বলিয়া ভস্ম হইতে চাহিতেছে। আমার মত পাপী জগতে আর কেহ নাই। তোমার নামেই আমি বিরক্ত হইয়া উঠিতাম—আমি নিজের গর্ব্বেই গর্ব্বিত হইয়া তোমার নাম শুনিতেই চাহিতাম না! তোমার অভাবে আমার প্রাণে যে কি অশান্তি গিয়াছে, তাহা তুমি জান আর আমি জানি। কতবার যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছি তাহাও তুমি জান; উঃ; মৃত্যুও আমাকে অযোগ্য বিবেচনা করিল! মা আমার! তোমার নাম ভুলিবার জন্য কত না চেষ্টা করিয়াছি। ওরে মূর্খ! অমন মধুর নাম কি ভোলা যায়? প্রভাতের কনক-তপন, নিশীথের শান্তিসুধা, যে দিকে চাহি, সেই দিকেই তো তোমারই হাতের লেখা। বাতাসের মৃদু হিল্লোল যখন তোমারই নাম বহিয়া আনিয়া কাণে কাণে বলিয়া যাইত, তখন তাহাও যেন সহ্য করিতে পারিতাম না—আমি এতবড় পাষণ্ড ছিলাম। না! আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর; মা—মা—বলিয়া আমাকে চীৎকার করিয়া একবার তোমাকে ডাকিবার অবসর দাও, আমার প্রাণটা একটু হালকা হউক। ভূধরের গাম্ভীর্য্য, সাগরের কল্লোলধ্বনি, অরণ্যের গগনস্পর্শী বৃক্ষরাজি, উপবনের সুগন্ধ পুষ্পপত্র, সকলই আজ আমার প্রাণে তোমারই নাম জাগাইয়া তুলুক। আজ অবধি তোমারই বাণী দিবানিশি প্রতিমুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে থাকুক।

২। ফিরে আসা।

জননী আমার! জননী আমার! আমি তোমার বড়ই দুষ্ট সন্তান। যে অবধি আমার জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই অবধিই তো দেখিতেছি, আমি বিপথেই চলিয়াছি। সুপথে চলিবার জন্য তুমি

আমাকে বারবার উপদেশ দিয়াছ; আমি তোমার সেই ভাল কথা শুনি নাই। আমার মঙ্গলের জন্য তুমি কতবার আমাকে শাস্তি দিয়াছ; কিন্তু আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছি। তখন তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিলে, যাহাতে সংসারের কঠিন কশাঘাতের আঘাত পাইয়া আবার তোমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসি। মা! ফিরিয়া তো আসিয়াছি। সারা সংসার ঘুরিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছি। একটুখানি তুমি কোলে লইবে, সেই আশায় ফিরিয়া আসিয়াছি। আঘাত যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি। কি সুন্দর দেহ তুমি দিয়াছিলে—সেই দেহ সংসারের কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কি সুন্দর মন দিয়াছিলে—আমার মন-প্রাণ সমস্তই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ সেই জীর্ণ দেহ, সেই ভাঙ্গা মন লইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি। শাস্তি যথেষ্টই হইয়াছে, আর শাস্তি দিও না। একবার আমাকে কোলে তুলিয়া লও। একবার তুমি তোমার এই হারানো ছেলেকে স্নেহভরা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধর। তোমার ঐ বুক হইতে স্নেহপ্রেম শতধারে ঝরিয়া আমাকে শান্তি দিক, আমার সেই দাবদগ্ধ প্রাণকে শীতল করুক। তোমার প্রাণের মধ্যে মিশিয়া গিয়া আমার নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে দাও। মা আমার! তোমার এই ধুলোকাদা-মাথা, এই রক্ত-মাখা ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইতে না চাও, ঘৃণা বোধ কর, তবে তাহাকে এইটুকু অধিকার দিও, সে যেন তোমার ঐ চরণতলে আছড়াইয়া পড়িয়া মরণটুকু লাভ করিতে পারে।

—

ভাব সেই একে।

(৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য)

আজ আমাদের পক্ষে বিজনে একাকী কিম্বা কোন সংঘের সমিতির সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উপনিষদ বেদান্ত কিম্বা উহাদেরই ভাবে জীবন্ত সাহিত্য আলোচনা করবার সুযোগ হয়েছে বলে আমাদের মধ্যে অনেকেই ধারণা করতে পারেন না যে, এক শ' বৎসর পূর্ব্বে যখন "ভাব সেই একে" রামমোহনের কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হয়েছিল, সেই দিনের গৌরব কতখানি। তখন মানব-সমাজ শ্যামল বসুন্ধরার ন্যায় সত্যই এক হলেও নানা খণ্ডে খণ্ডিত ছিল। মানবত্বের অখণ্ড ভাব ধারণা করা তখনকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের মনীষিগণের পক্ষেই দুরূহ ছিল বল্লে অত্যুক্তি হয় না। আত্মার অখণ্ডত্ব তখনকার কবিদেরও কল্পনার অতীত ছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পুরাণ দর্শন, এমন কি, বিজ্ঞান আলোচনা করলেও দেখা যায় যে ধর্ম্মকেই এখানকার মনীষিগণ ভিত্তি করেছিলেন, প্রবৃত্তিকে নয়। এবং বাংলা এই বিশেষত্বটি একশত বৎসর পূর্ব্বে নবরূপে রূপম্ করে তুলেছিল "ভাব সেই একে"র মন্ত্রে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাই জগৎকে এই সমদর্শিত্ব দান করেছে এবং আজ য়ুরোপ আমেরিকার বিজ্ঞানও বলেছেন জগতের মূলে এক অদ্বিতীয় অবাঙ্‌মনসগোচরকে সত্যই প্রত্যক্ষ করা যায়।

নব যুগের আরম্ভ য়ুরোপে বেকনের আবির্ভাব হতে হলেও ফরাসীগণের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা মানব-সমাজে স্থাপন করবার চেষ্টাকেই আমরা নব যুগের প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে পারি। ফরাসী জাগরণের মূলে কোন ধর্ম্মবিশ্বাস না থাকার দরুণ বর্ত্তমান য়ুরোপকে মধ্য যুগের য়ুরোপ হতে রক্তসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে; কিন্তু রামমোহনে আমরা দেখতে পাই যে ফরাসী জাগরণের ঐ তিনটী মহামন্ত্র "ভাব সেই একে"র অঙ্গীভূত হওয়াতে বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে মধ্যযুগের ভারতবর্ষ হতে আসতে হয়েছে প্রীতির দ্বারা। আমাদের সভ্যতার এই বিশেষত্বটী বিস্মৃত হলে আমরা আমাদের শক্তি কোথায়, গৌরব কোথায়, আশা কোথায় বুঝতে অসমর্থ হব; আমরা আমাদের স্ব-ভাব বিচ্যুত হওয়াতে মানবসমাজের একটা অনাবশ্যক জড় ভারস্বরূপ হব।

ফরাসি জাগরণের সার্থকতা যেমন একদিকে আছে, তার ব্যর্থতাও তেমনিই ভীষণ; য়ুরোপের সকল নেশনই উনবিংশ শতাব্দী হতে পরস্পরকে হত্যা করতে নানা অস্ত্র নির্ম্মাণ করে আসছে এবং এখন কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নেই। এ ব্যর্থতার কারণ কি? স্বাধীনতার স্পৃহা! বিশ্ব-প্রকৃতির অনন্ত শক্তিপ্রবাহের চিরন্তন উত্থান-পতনের বিরাট আন্দোলনের মধ্যে অহোরাত্র থেকেও মানুষ যে স্বাধীনতা লাভ করতে চায়—এ কি তার দুরাশা? মাতৃগর্ভের নিঃশব্দ স্নেহ হতে যে জগতে মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়, মা হতে পৃথক হয়ে জীবন উপলব্ধির প্রথম মুহূর্ত্তেই তার আশঙ্কা হয় জগৎ তার অনুকূল নয়, মাতৃক্রোড়ে থাকবার নিঃশব্দ স্নেহের সেই পরিচিত কোমল উত্তাপ জগতে নেই। জগৎ তার নিজের

গতিবেগে অবিরাম চলেছে বলেই নির্ম্মম। গতির বিরাম নেই। দিবসের আলোকে এবং রজনীর অন্ধকারে, বৈশাখের প্রখর উত্তাপে এবং পৌষের শীতে জগতের প্রত্যেক কণাটি এক আয়ত্তের অতীত শক্তিপ্রবাহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রূপ হতে রূপান্তরে, বর্ণ হতে বর্ণান্তরে, গুণ হতে গুণান্তরে, স্থান হতে স্থানান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে, এক যুগ হতে অন্য যুগে চলেছে; অনুকূলই হউক কিম্বা প্রতিকূলই হউক, গতির বিরাম নেই; তার দৃষ্টি সর্ব্বদাই সম্মুখে, লক্ষ্য কত দূরে কে জানে? এই যে জীবনমৃত্যুর আলোছায়ায় ছককাটা ঘরখানি,—জগৎ—মানুষ দেখছে যে সে আলো হতে ছায়ায়, ছায়া হতে আলোতে যাতায়াত করছে, তার প্রাণশক্তি রূপান্তরিত হচ্চে মাত্র, এর এলাকার বাহিরে না গেলে মুক্তি কোথায়?

অথচ বাহিরে যাবে কিরূপে? জগৎ আমাদের পরিপুষ্টির পক্ষে কত আবশ্যক! একে না হলে আমরা এক লহমাও বাঁচতে পারি না। এর রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ আমরা আমাদের নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তেই আত্মসাৎ করি; এর আলো আমাদিগকে জাগিয়ে দেয়, এর অন্ধকার আমাদিগকে মৌন করে, স্তব্ধ করে; এর বাতাস আমাদের নিশ্বাস জোগায়, এর আকাশ আমাদিগকে কতদূরে অনন্তের মধ্যে আহ্বান করে। "কেন যে প্রাণের এত প্রবাহ, তার কোন কৈফিয়ৎ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। সেই অনন্ত কালের দুর্ভেদ্য নীরবতা সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষেও যেমন, আজও তেমনি রয়েছে। জগতের এই প্রাণোচ্ছ্বাসের পূর্ণ অবস্থাটিকে, যার সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়মনের ভাববিনিময় চলছে, প্রত্যেকেই শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়। কি বিস্তীর্ণ, কি ঐশ্বর্য্যশালিনী এই মহিমময়ী প্রকৃতি! মানুষের প্রত্যেক বৃত্তিকে, প্রত্যেক শক্তিকে প্রকৃতির প্রত্যেক গুণ কি আশ্চর্য্যরূপে আহ্বান করছে। এর উর্ব্বরা ক্ষেত্র, অর্ণবযানের যাতায়াতের উপযোগী মহাসাগর, নানাবিধ ধাতু এবং প্রস্তরময় শৈলমালা, নানা শ্রেণীর বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন অরণ্য; অসংখ্য জীবজন্তু, রাসায়নিক উপাদানসমূহ; আলোকের, উত্তাপের, আকর্ষণ-বিকর্ষণের জীবনীশক্তি, এবং বিচরণপ্রণালী, এই সকল নিয়েই যে জগৎ,—জ্ঞানে এই জগৎকে আয়ত্ত এবং প্রেমে ভোগ করে শক্তিশালী মহাপুরুষগণ তাঁদের শক্তির চরম সার্থকতা উপলব্ধি করছেন, ইহাই তাঁদের উপযুক্ত ক্ষেত্র।"

অথচ মানুষ স্বাধীনতা চায়, প্রকৃতির অধীন হয়ে থাকতে চায় না। জগতে অসংখ্য রূপের এবং শক্তি সংঘর্ষণের মধ্যে পড়েও মানুষ তার নিজের 'স্ব'কে জগৎ হতে স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধি করে, সে এক নূতন বাণী শ্রবণ করে, প্রত্যক্ষগোচর প্রকৃতির বাহিরে এসে আত্মবান্ হবার আনন্দ উপভোগ করে। অখণ্ড বিশ্বশক্তি যে তার মধ্যে এক বিশিষ্ট মানবস্বরূপে কেন সু-পরিচ্ছিন্ন হয়, ইহা এক নিগূঢ় রহস্য। মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিপ্রবাহে আত্মলোপ করতে পারে না বলেই তার উন্নতি, সভ্যতা। মধুমক্ষিকা আজও ঠিক সেই রকমেই তার মধুচক্র নির্ম্মাণ করছে বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেমন করত এবং বিশ হাজার বৎসর পরেও যেমন করবে; কিন্তু মানুষ যে আনন্দমধু পান করবার চক্র আজ নির্ম্মাণ করছে, বিশ শতাব্দী পূর্ব্বে তা ছিল না এবং বিশ শতাব্দী পরেও তা থাকবে না। তখন নবীন মন আবার নবীনভাবে আত্মাকে উপলব্ধি করে এক নূতন ভাবজগৎ নির্ম্মাণ করবে।

এই ভাব-জগৎ যে মানুষ নির্ম্মাণ করে, সে কি এক মাত্র তারই শক্তিতে? না তারও চেয়ে এক মহান আত্মা তার মধ্যে আপন সৃজনী শক্তি দান করেন বলেই মানুষ তার নিজের আনন্দ হতে এক নূতন ভাবজগৎ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়? জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছুশ্ছেদ্য না হলেও দেখা যায় যে, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের স্তরে স্তরে তাহা নূতন ভাব ধারণ করে। স্থূল দেহের সুখেই যে সুখী, সে জগতের মৃন্ময় অংশ নিয়ে পাঁচ ছয় তলার ইমারত তৈরী করে তৃপ্তিবোধ করে; কিন্তু এ কাজ ত পিপীলিকাও করতে পারে। সূক্ষ্মদেহের সুখেই যে সুখী, সে জ্ঞান-জগৎ সৃষ্টি করে; কিন্তু তার হৃদয়ের নিগূঢ় অন্তঃপুরে একটা ক্রন্দন ধ্বনিত হয়,—জগতে নিয়মই কি সব? এর কি এক অদ্বিতীয় নিয়ামক নেই? কারণশরীরেই যে সুখী সে জগতের নিয়ামকের সঙ্গে এক নিগূঢ় ভাবের যোগ উপলব্ধি করে, কেহ বা নিয়ামকের সন্তানবাৎসল্য উপলব্ধি করেন, কেহ বা তাঁর সখাভাবে অনুপ্রাণিত হন। যে স্বাধীতা লাভ করবার জন্য মানুষ সকল রকম গতানুগতিকতার কারাগার হতে বাহির হয়, এতক্ষণ পরে তার যাত্রা শেষ হয়, তখন আর তার মৃত্যুভয় থাকে না।

এই যে মানুষের নব নব মনোজগৎ গড়ে তোলা, সভ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের চেষ্টায় ঐ লক্ষ্যেই তার শক্তি কেন্দ্রীভূত দেখা যায়। এবং মানুষ তার জীবন্ত কলেবর ততদিনই স্বীকার করে যতদিন সে দেখে যে তারও চেয়ে উন্নততর, সূক্ষ্মতর কলেবর ধারণ করবার সামর্থ্য না হয়েছে। প্রাণশক্তি স্বভাবতই স্বাধীনতা চায়; যখন দেখে যে পুরাতন দেহ থাকার দরুণই তার স্ব-ভাবের বিকাশের বাধা ঘটছে, তখন জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে স্ব-ভাব ব্যক্ত হবার অনুকূল নব নব দেহ ধারণ করে। আমরা

মুখে বলি বটে অমুক লোক অকালে মারা গেল, কিন্তু জগৎনিয়ন্তার নিয়মে জগতে অকালে কোন কিছুই ঘটে না—জন্মও নয়, মৃত্যুও নয়।

ফরাসী জাগরণ যে স্বাধীনতার মন্ত্র বিশ্বমানবকে শুনিয়েছিল, তা হচ্ছে গতানুগতিকতার আধিপত্য হতে প্রাণশক্তিকে মুক্ত করে নব নব মনোজগৎ এবং তা থেকেই সংসার সমাজ গড়ে তোলবার স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে। এ চেষ্টা একমাত্র মানুষেই আছে; কিন্তু ঐ চেষ্টা নিম্নস্তরের কামনায় কলুষিত হওয়ার দরুণ উহা মানুষকে সত্যই মুক্ত করতে পারে নি, মুক্তির আনন্দ তখনো কত দূরে ছিল।

তারপর সাম্য। মানুষে মানুষে শক্তির তারতম্য থাকাতে একবার সকলকেই সমান নিঃস্ব করে তারপর সম্পদ প্রত্যেককে সমানভাগে ভাগ করে দিলেও কিছুদিন পরে দেখা যায় কেহ বা ধনী হয়, কেহ বা আবার নিঃস্ব হয়; কেহ বা স্ব-ভাবের বলে অন্যকে শাসন করে, কেহ বা শাসিত হতেই চায়। তামসিক ভাব যে মানুষে প্রবল, সে অন্যের অধীনই হতে চায়; রাজসিক ভাব যার যে পরিমাণে জাগ্রত হয়েছে সে অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। মানব-সভ্যতার সুবর্ণরথ সহস্র চক্রের মেঘমন্দ্রে অবিরাম চলেছে সত্য, যারা এই রথের রথী, তারা সম্পদশালী, দীর্ঘায়ু, দেহে মনে বলিষ্ঠ; আর যাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সেই রথের চাকাগুলি ঘুরতে ঘুরতে চলেছে, তারা কি অসহায়, কি দরিদ্র! কোটী কোটী দীনদরিদ্রের প্রাণ শোষণ করেই না দিগ্বিজয়ী বীরের শিরে স্বর্ণমুকুট শোভা পেয়েছিল? ফরাসীগণ যে সাম্য স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিল, তাহা বাহিরের ধন সম্পদের। মানুষ তার প্রয়োজনের চেয়েও অধিক অর্জ্জন করে এবং অর্জ্জিত সম্পদ নিজের ব্যবহারে না এলেও নিজের দখলে রাখে; এ থেকেই অবস্থার বৈষম্য হয় এবং এ বৈষম্য একমাত্র মানুষেই আছে।

অবস্থার বৈষম্য, মনের বন্ধন যদি রয়েই গেল, তা হলে মানুষে মানুষে মৈত্রী হবে কিরূপে? সত্য কথা। মানুষে মানুষে মৈত্রী। দুইটী জড়বস্তুকে পাশাপাশি গায়ে গায়ে, একটার পর আর একটাকে চিরকাল রেখে দেওয়া যায় সত্য; এবং যদি কোন দেশে কোন গ্রামে এমন দেখা যায় যে জনকতক পাশাপাশি গায়ে গায়ে বহুদিন ধরে রয়েছে, তা হলে তাতে প্রমাণ হয় তারা জড়, প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মাকে উপলব্ধি করবার যে ভগবৎদত্ত অধিকার আছে, তা হতে প্রত্যেকেই বঞ্চিত। আত্মা ত সর্ব্বক্ষণই ক্রিয়াশীল। "মানুষ কি? কত যুগ-যুগান্ত ধরে পরম পুরুষ প্রকৃতিতে আত্মভাব প্রকাশ করে আসছেন; মানুষে তারই সুন্দর সমগ্র ভাবটী প্রকাশ হয়ে উঠছে; ইহাই না? এই জন্য মানুষ কি প্রকৃতির সকল চেষ্টার সুন্দর সফলতা নয়? ঐ যে সুদূর দিগন্তে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী রয়েছে, মানুষ কি তাদের চেয়েও গম্ভীরতর মহত্তর প্রকাশ নয়? প্রকৃতি নীরব আকাশ হতে, স্তব্ধ গিরিশ্রেণী হতে, কলকলনাদিনী তরঙ্গিণী হতে, বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্র হতে তিল তিল গ্রহণ করে যে মানুষকে সৃজন করছেন, তার ভাষা কি! তার চিত্রানুরাগই বা কি! আলোকে এবং অন্ধকারে বিচিত্রা বহিঃপ্রকৃতিকে কিম্বা আনন্দে এবং বিষাদে আন্দোলিত অন্তঃপ্রকৃতিকে ভালবাসাই বা কি! এই প্রেমই ত প্রকৃতির পরম সুন্দর সফলতা! ইহারই জন্য আমাদিগকে কত কোটী যোজন স্থান উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়েছে; আজ সেই শ্রান্তিকর পথের অবসানক্ষণে, সেই দুর্গম যাত্রার অশ্রান্ত গতির লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হবার মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে স্থানের এবং কালের ব্যবধান অন্তর্হিত হয়ে গেছে, কেবল রয়েছে সেই দীর্ঘযাত্রার অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সাধকের চিদাকাশে একটী রসমধুর সঙ্গীতমূর্চ্ছনা"। "জগতের একটী মাত্র বস্তুই যথার্থ মূল্যবান—ক্রিয়াশীল আত্মা। প্রত্যেক মানুষই ইহা লাভ করবার অধিকারী। প্রত্যেক মানুষই ইহা নিজের মধ্যে ধারণ করে,—যদিও প্রায় সকলেরই অন্তঃকরণে ইহা বাধাপ্রাপ্ত এবং এখনও যেন জন্মগ্রহণ করে নি। ক্রিয়াশীল আত্মাই একমাত্র সত্য দর্শন করে, সত্য প্রচার করে,—ইহাই সৃজন করা। প্রতিভা ত সৃষ্টি করবার শক্তি—অনুগৃহীত জনের এখানে সেখানে দুই চারিটা সুবিধা ভোগের ন্যায় নহে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ দখলী সম্পত্তি। গ্রন্থই বল, বিশ্ব-বিদ্যালয়ই বল, কলা-নিকেতনই বল কিম্বা যে কোন অনুষ্ঠানই হউক না,—অতীতকালের কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তির আত্মপ্রচার ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রতিভার দৃষ্টি সম্মুখে, মানুষের চক্ষু তার কপোলের অস্থিতে, পশ্চাদ্ভাগে মস্তিষ্কের খুলিতে নয়; মানুষ আশা করে, প্রতিভা সৃজন করে; শক্তিশালী বুদ্ধিমানের মগজে যে কোন শক্তিই থাকুক না, তিনি যদি সৃজন না করেন, তাহা হলে ঈশ্বরের আবিষ্কৃত ঐশী সত্তাকে, শক্তিপ্রবাহকে তিনি আপনার করেছেন বলতে পারেন না; তাঁর মধ্যে অগ্নিময়ী ঐশীবাণী এখনও জ্বলে নি, কেবল মাত্র কতকগুলা ধোঁয়া এবং পোড়া কাঠ। এমন কতকগুলি চালচলন, কাজ করবার কৌশল আছে, আত্মার এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে, এবং এমন সকল ভাষা আছে, যারা সৃজনই করে থাকে, ইহা কোন প্রথা নির্দ্দেশ করে না কিম্বা কোন উপরওয়ালার শিলমোহরের ছাপ এদের গায়ে দেখা যায় না; অপর পক্ষে, সত্য এবং সুন্দরের উপলব্ধি হতেই ইহারা স্বতঃ উৎসারিত হয়"।

সমাজের সঙ্ঘের মধ্যে নিশ্চলভাবে দশজনের বহু-কাল পাকাকে সদ্ভাবে থাকা বলা যায় না। চিৎশক্তি যার জাগ্রত, সেই সত্য সদ্ভাবে থাকতে পারে। মৈত্রী ত জড় বস্তুর মত গায়ে গায়ে লেগে থাকা নয়। মন যার জাগ্রত, ধীশক্তি যার একেকেই বহুর মধ্যে দর্শন করে, তারই ত হৃদয় হতে যথার্থ আত্মজ্ঞাননিঃসৃত করুণা ও মৈত্রী পূতধারার মত সকলের মধ্যে প্রবাহিত হয়। তিনিই সকল মানুষের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট আত্মাকে দর্শন ক'রে দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হন; সুখীর সৌভাগ্যে আনন্দিত হন। তিনিই যথার্থ লোকহিতৈষী হয়ে মানুষের ত্রি-তাপ নাশ করতে আত্মদান করেন।

ফরাসী-জাগরণ যে সাম্য প্রচার করেছিল, তা সমদর্শিত্বে প্রস্ফুট হয় নি বলেই বিশ্বমানবের দিক হতে মানবসমাজে "ভাব সেই একে" প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অবস্থা ততক্ষণই পরাধীন, যতক্ষণ না মানুষ প্রকৃতিকে ঠিকমত জেনে যে পরম একে প্রকৃতি বিধৃত হয়ে আছে তাঁকে জানতে পারে; জানতে পারলেই সে বলতে পারে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

মানুষে মানুষে শক্তির তারতম্য থাকার দরুণ সকলের অবস্থা কখনই সমান হবার নয়। একবার সকলকে সমানভাবে সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করে দিলেও ধনবান্ তার স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য ইস্পাতে এবং ভাব-ভাবনায় তৈয়ারী অস্ত্র যতই নির্মাণ করবে, ততই তার সম্পদে আরও দশজনকে মনুষ্যত্বলাভের অনুকূল অবস্থা করে দেওয়ার আবশ্যকতা স্বীকার করবে না; প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে অবিশ্বাস করবার কলুষতায়, এবং ইস্পাতে ও ভাব-ভাবনায় তৈয়ারী অস্ত্রের ঠোকাঠুকিতে, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, নেশনের সঙ্গে নেশনের সংঘাতে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এক মহা সমরানল জলে ওঠে।

কিন্তু এই জন্যই সমদর্শনমূলক সাধনপ্রণালী প্রচার করা বিশ্বমানবের দিক হতে প্রয়োজন ছিল। এত পরাধীনতা, বৈষম্য, বৈরীবুদ্ধি ও বৈরী-আচরণ থাক্‌লেও মানুষের আত্মা মুক্তি চায়, কর্ম্মচেষ্টা সাম্য চায় এবং হৃদয় মৈত্রী চায়। কেননা জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের ভিতর দিয়েই না তার আত্মার প্রকাশ; বাধার অন্ত নেই, অথচ চেষ্টারও বিরাম নেই। ইহাই মানবজীবন লাভ করবার গৌরব। ইহা এক নিগূঢ় রহস্য সন্দেহ নেই, মুমুক্ষুগণের জীবন এই রহস্য উদ্‌ঘাটন ভিন্ন ত আর কিছুই নয়। ইহারই কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়ে আসছে। এই আকাঙ্ক্ষা, এই চেষ্টা, এই আশা জাতি-বর্ণনির্বিশেষে প্রচার করবার উদ্দেশ্যেই রামমোহন "ভাব সেই একে" মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। সমদর্শনের বিরাট উপলব্ধির মধ্যে তিনি ফরাশিগণের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাও গ্রহণ করেছিলেন, এবং সমদর্শিত্বের শান্তিময় প্রভাবে বিপ্লবের জ্বালা তাঁর মধ্যে প্রশমিত হওয়াতে দস্যুবৃত্তিবর্জ্জিত সাধনপথে ভারতবর্ষকে পরিচালনা করেছিলেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার উন্নতিলাভ করতে জ্ঞানে ও প্রেমে রত ছিলেন। যে জ্বালায় য়ুরোপ ভস্মীভূত হয়েছিল, সে জ্বালা আসলে বিশ্বাত্মারই বুকের জ্বালা। ধর্ম্মসংস্থাপন করবার জন্য বিশ্বাত্মা তেজোময় কালপুরুষের মূর্ত্তিগ্রহণ যে করেন, তার প্রমাণ ইতিহাসে বহুবার পাওয়া যায়। এ প্রকাশকে রামমোহনের আস্তিক মন উন্মাদের প্রলাপ বলে তিরস্কার করতে পারে নি। সেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের মূলে যে আত্মার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং যিনি সহস্র সহস্র নর-নারীর শোণিতের উত্তপ্ত প্রবাহ দিয়ে তাঁর দুর্দ্দমগতিতে অমোঘ প্রভাবে দেশ হতে দেশান্তরে, পাপের আশ্রয় জীর্ণ কাঠামকে ধূলিসাৎ করে অগ্রসর হতে হতে যখন ভারতবর্ষের তীরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তখন রামমোহন তাঁকে ভারতে তুলে নিয়েছিলেন এবং তখন সেই পরমপুরুষ ভক্তের কাতরতায় ভীষণা মূর্ত্তি, লোক-সংহারিণী চেষ্টা নিজের মধ্যে সংকোচিত করে রামমোহনকে তাঁর প্রসন্নমূর্ত্তি, লোকস্থিতির অনুকূল দিব্য জ্ঞান, বিমলা ভক্তি দান করেছিলেন। রামমোহন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক ভিত্তি সমদর্শন এবং অন্তরে বাহিরে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে পরমপুরুষ একই ভাবে নিত্য বিরাজমান তাঁকে কেবল নির্জ্জনে ধ্যানে নয়, নানা স্বার্থের সংঘাতে কলুষিত কর্ম্মক্ষেত্রেও উপলব্ধি করতেন। জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে লোকের হিতসাধনে তিনি যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তার মূলে দেখা যায় এই সমদর্শন—"ভাব সেই একে"।

মানুষের এবং পরমপুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কে? রহস্যময়ী প্রকৃতি। য়ুরোপের নবজাগ্রত মন এই প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়েছিল এবং এখনো যে সে মোহ নেই, তা বলা যায় না। প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা হতে নবযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান উন্নতিলাভ করেছে। প্রকৃতির নানা ঋতুর বর্ণ, গন্ধ, সঙ্গীত তাদের মনকে অসংখ্য বাসনায় জাগিয়ে তুলেছে, প্রকৃতির আলোকচ্ছায়ায় তারা কখনো পুলকিত, কখনো বিস্মিত। কিন্তু প্রকৃতি বিধৃত হয়ে আছে যে পুরুষে,

তাঁকে ধ্যান করতে, তাঁকে জানতে জনসাধারণ সাহস করে নি, এবং তাঁর সামীপ্য লাভ করবার আনন্দও উনবিংশ শতাব্দীর কবিগণে পাওয়া যায় না; কেন না তাঁরা জীবনে তাঁকে ঠিকভাবে পান নি।

কিন্তু এ সত্ত্বেও মানুষ পশুদের ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখেই দিনযাপন করতে পারে না এবং তাহার হৃদয় কোন এক অদ্বিতীয়, অতীন্দ্রিয় পুরুষে বিশ্বাস, ভক্তি করতে চায়। ধর্ম্মজীবন এই বিশ্বাস, ভক্তি হইতেই আরম্ভ হয়। ধর্ম্মকে এক শ্রেণীর মানুষ আকারে যতই সঙ্কীর্ণ করুক না, মানুষের মনে ভাবের জন্য ধর্ম্মের জন্য এই যে ব্যাকুলতা, ইহা অত্যন্ত সত্য; এমন কি স্বাভাবিক। এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় পুরুষের স্নেহে, করুণায় বিশ্বাস না থাকলে নৈরাশ্যের অন্ধকার-রাত্রিতে, বেদনার তিমির-কুজ্ঝটিকায় মানুষ কার পানে চাইবে? সে যে নিতান্তই ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, অসহায়! তার অহংজ্ঞান কোন এক মহান্ পুরুষের বরাভয়করের আশ্রয়ে না দাঁড়ালে যে আত্মঘাতী হয়ে ওঠে, সকাল-সন্ধ্যা পিতামাতাকে প্রণাম না করলে তার সংসারযাত্রা যে আত্মঘাতিনী হয়ে ওঠে। আত্মিক জীবনের ব্যর্থতা প্রতিমুহূর্ত্তেই তাকে মর্ম্মাহত করতে থাকে। কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে তার আশা সফল হবে, এ বিশ্বাস না থাকলে আত্মিক জীবন যে তার পক্ষে দুর্ব্বহ!

সেই জন্য বিশ্বমানবকে মহাত্মা রাজা রামমোহন তথা ব্রাহ্মসমাজ জীবনের মূল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন এবং এখনও দিচ্ছেন—

"ভাব সেই একে"!

রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরিভাষা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত "প্রকৃতি"—পত্রের গত শীতসংখ্যায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রাসায়নিক পরিভাষা" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি শুধু সুন্দর বলিলে চলিবে না, ইহার ছত্রে ছত্রে বিজ্ঞানপ্রীতি ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে লেখকের অন্তর্নিবেশ পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধ অবলম্বনে আমাদেরও দুই চারিটি বক্তব্য বলিবার অধিকার আছে মনে করি, কারণ বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই।

লেখক একস্থলে বলিয়াছেন—"কেহ কেহ বলেন যে, স্বতন্ত্র পরিভাষার প্রয়োজন নাই, ইংরাজী শব্দগুলি যেমন আছে সেইরূপ রাখিলেই চলিবে।" প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় এবিষয়ে লেখক একমত নন। লেখক ভীতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, "অতগুলি ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিলে বঙ্গভাষার দফারফা হইবে এবং কালে ইহা ইংরাজী হইতেই উদ্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইবে।" আমরা যদিও লেখকের এই আশঙ্কার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না, তথাপি তাঁহার সঙ্গে এবিষয়ে একমত যে, স্বতন্ত্র পরিভাষার প্রয়োজন আছে। জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশের যে দৃষ্টান্ত লেখক উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে এবং আমাদের সহজ বুদ্ধিতে স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, বিজ্ঞানে উন্নতি ও সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে বাল্যকাল অবধিই বিজ্ঞান শিক্ষা করা উচিত, এবং তাহা করিতে গেলেই সরল বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ পড়িতে হইবে; সুতরাং তাহার জন্য বাংলা পরিভাষা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ৺অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বারা অনুবাদ করাইয়াও বাংলা ভাষায় বিস্তর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখানো হইত। আমার বেশ মনে পড়ে, আমার তখন ৭।৮ বৎসর বয়স; সেই সময়ে ৺অক্ষয়কুমার দত্তের বাংলা "পদার্থবিদ্যা" গ্রন্থ ছিল বলিয়াই পিতৃদেব আমাদিগকে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম শিক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অক্ষয় কুমার দত্তের পরেই পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ এবং তৎসঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংরচনে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার ম্যাকনামারা সাহেবের রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতাক্ষেত্রে বহিশ্ছাত্ররূপে উপস্থিত থাকিয়া notes লিখিয়া আনিতেন এবং গৃহে আসিয়া সদ্য সদ্য তাহা হইতে বক্তৃতার বিষয় যথাসম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল বাংলায় লিপিবদ্ধ করিতেন। তাঁহার লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়া শ্রদ্ধেয় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত পণ্ডিতবরেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। আজ ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম" বলিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সকল বিভাগই স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ত্রিবেদী মহাশয় লিখিতেছেন—"এই গ্রন্থে তাড়িতবিজ্ঞান শব্দ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখার সম্বন্ধে প্রস্তাব আছে। এই গ্রন্থের রচনার পূর্ব্বে বোধ হয় এই সকল বিষয়ে কেহ কোন কথা লেখেন নাই, অদ্যাপি সম্যক চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয় না।" * * * "গ্রন্থকার বিবিধ বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সংকলনে বিশেষ

উদ্যোগী ছিলেন। ইহাঁর মধ্যে অনেকে ভাষায় স্থায়িত্ব লাভ করিবে আশা করি।”

৺অক্ষয়কুমার দত্ত, পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আধুনিক পরিভাষা-রচয়িতাদিগের কার্য্যকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, কতকগুলি ইংরাজী শব্দ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করিলে মন্দ হয় না। দৃষ্টান্ত দিই—অক্সিজেন শব্দ। বাল্যকাল অবধি আমরা “কেতাবে” পড়িয়া আসিয়াছি—অক্সিজেনের বাংলা অম্লজান। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া গ্রন্থসাহায্যে অধীত হইলেও উহা তো সাধারণ্যে প্রচলিত হইল না। কারণ কি? কারণ এই যে, স্কুল-কলেজে ঐ গ্রন্থে পড়া বাদে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা অক্সিজেন শব্দই ব্যবহৃত হয়। ডাক্তারখানায় গিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে—‘রোগীর প্রাণসংশয়, ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন অক্সিজেন দিতে হইবে, অতএব অক্সিজেন দিবার যন্ত্র দাও।’ এই স্থলে যদি অম্লজান দিবার যন্ত্র চাওয়া যায়, তবে কর্ম্মচারীরা কতকক্ষণ হয় তো আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া দিবে—‘অম্লজান কি তাহা জানি না এবং তাহা দিবার যন্ত্রও নাই।’ এই সকল কারণে অতিপ্রচলিত শব্দগুলিকে অপ্রচলিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া সেগুলিকে আত্মসাৎ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করি। আর একটি ঐরূপ শব্দ মনে পড়িতেছে—সোডা। পিতৃদেব উহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন “সর্জ্জিকা”। কিন্তু আমার মতে “সোডা” শব্দকে বাংলাভাষার বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করা কর্ত্তব্য। তবে ঐ সকল শব্দের অনেকগুলি প্রতিশব্দ বা synonymn রাখিতে চাও, সে তো ভাল কথা—গ্রন্থরচনার সময় নানাভাবে নানা শব্দের ব্যবহার আবশ্যক হয়।

উপরে যে মন্ত্র বলিলাম, তদনুসারে অক্সিজেনের লেখক-প্রদত্ত “অক্ষজন” শুনিতে মূলের অনেকটা কাছাকাছি গেলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থায়িত্ব—শুধু কেতাবে নহে, কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয়ে—লাভ করিবে কি না সন্দেহ। এক্ষেত্রে সেই সাহেবের বাংলা শেখার কাহিনী মনে পড়ে। সাহেব অনেক কাল ধরিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট বাংলা শিখিয়া একদিন মনে মনে স্থির করিলেন যে তিনি বাংলা সুন্দর শিখিয়াছেন এবং পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট পরীক্ষা দিতেও স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে একদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে পণ্ডিতমহাশয় সাহেবকে একটা নৌকা ডাকিয়া দিতে বলিলেন। সাহেব ডাকিলেন—“কর্ণধার! তরণী তীরে লইয়া আইস।” কে-ই বা তাঁহার কথা বোঝে; কাজেই কে-ই বা তাহা শোনে। শেষে তাঁহার পণ্ডিত মহাশয় যখন হাঁক দিলেন—“ও—মাঝি, নাউ কিনারে ভিড়া”, তখন মাঝি কথাটা বুঝিল এবং নৌকাটা কিনারায় আনিল। সেইরূপ আশঙ্কা হয় যে, ইংরাজী অতি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির, মূল ধরিয়াই হোক বা অন্য যে কোন উপায়েই হোক, বঙ্গানুবাদ করিয়া চালাইতে গেলে আমাদেরও অবস্থা ঐ সাহেবের মত হইবে। লেখক ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ গ্রহণের সঙ্গে কলিকাতাকে “Calcutta” উচ্চারণ করিবার যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রদত্ত প্রতিশব্দগুলির মধ্যে নিম্নের কয়েকটি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল এবং সেগুলির স্থায়িত্বের আশা আছে বলিয়া মনে হয়:—অক্ষজন (যদিও বহুল-প্রচারিত বলিয়া অক্সিজেন শব্দই বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করি), আর্দ্রজন, কারবণ, বরমীণ, ভাস্করস (এখানেও বহুল-প্রচারিত বলিয়া ফস্ফরস শব্দকেই বজায় রাখা সঙ্গত মনে করি), শুল্‌্বারি, শিলাকণ, তর্জরম এবং বোরণ। nitrogenএর প্রতিশব্দ নেত্রজন ব্যবহার চলিবে কি না সন্দেহ—প্রথমেই নেত্র অর্থে চক্ষুই সর্ব্বপ্রথম মনে আসে, যাহার সঙ্গে nitrogenএর কোনও সম্বন্ধ নাই। ক্লোরীনকে প্লোরীন করিবার সার্থকতা দেখি না। কুলহরিণ (chlorine), এতিন (iodine) আমাদের তো মনে হয় অচল! অন্তমনীকম (antimony), অর্জিনিক (arsenic) চলিলেও চলিতে পারে। বিষমদ (bismuth) অর্থে, যে বিষে মত্ততা আসে, এই প্রকার একটা কোন ভাব মনে জাগে। সলিলীনম (selenium) চলিলেও চলিতে পারে। যেগুলি চলিতে পারে, দেখিতে হইবে, সেগুলি চলিলেও তাহাদের conotationএ কোন প্রকার গোলমাল না বাধিয়া যায়। লেখক ইংরাজী শব্দের ফরাশি ও জার্ম্মন যে প্রতিশব্দ দিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, একই শব্দ বিভিন্ন ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, কেবল উচ্চারণের তারতম্যে যেটুকু পার্থক্য ঘটিয়াছে।

স্বতন্ত্রভাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অবতারণা করিলে যাঁহারা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানচর্চ্চার অসুবিধার কথা বলেন, তাঁহাদের যুক্তি সবল বলিয়া মনে হয় না। আমরা যে ইংরাজী বা ফরাসি বা জর্ম্মন ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্যত হই, ইহাই তো ঐ যুক্তির মূলচ্ছেদন করিতেছে। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান যদি এতদূর সমুন্নত হয় যে, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক আসন অধিকার করিতে পারে, তবে তো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির বৈজ্ঞানিকগণ বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া বাংলায় প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আয়ত্ত করিতে বাধ্য হইবেন।

উপসংহারে পিতৃদেবরচিত “প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

স্থূলমর্ম্ম" গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত কতকগুলি ইংরাজী শব্দ ও তাহার বাংলা প্রতিশব্দ আগামী সংখ্যায় দিবার ইচ্ছা রহিল—তন্মধ্যে কতকগুলি পিতৃদেবের রচিত এবং অপরগুলি বিজ্ঞানভিক্ষু ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের রচিত। এই সকল প্রতিশব্দ হইতে বুঝা যাইবে যে পূর্ব্বে প্রধানত ইংরাজী শব্দের বুৎপত্তি ও তাহার অর্থের উপর নির্ভর করিয়াই প্রতিশব্দ রচিত হইত। মণীন্দ্রবাবু এগুলিরও প্রতি মনোযোগ দিয়া ইংরাজীতে যেমন Dictionary of Scientific terms আছে, সেইরূপ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের এক এক বিভাগের এক একটি ক্ষুদ্রাকৃতি অভিধান প্রণয়ন করিলে বাংলায় বিজ্ঞান-লেখকের অত্যন্ত উপকার হয়। এবিষয়ে আমরাও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। *

নবপত্রিকাপ্রবেশ †

(দুর্গোৎসব)

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

নবপত্রিকাপ্রবেশ দুর্গোৎসবের প্রাথমিক ও প্রধান অঙ্গ। অন্য কোন দেব-দেবীপূজায় নবপত্রিকাপ্রবেশের আবশ্যক হয় না। এই নবপত্রিকাপ্রবেশের মর্ম্ম অবধারণ জন্য ইতিপূর্ব্বে যে ভাবে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, বিষয়টি পরিস্ফুটভাবে সাধারণের চক্ষে তেমন ভাবে ধরা হয় নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় "মৎস্যপুরাণোক্ত দুর্গাপূজাবিধি" প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই আমরা অবলম্বন করিয়াছি। অনেকের মতে মৎস্যপুরাণোক্ত পদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে অন্যান্য পুরাণ-তন্ত্রোক্ত বিধি প্রচলিত থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ তত অধিক নহে। দুর্গোৎসবের পূর্ব্ব দিনে অর্থাৎ ষষ্ঠী তিথিতে সন্ধ্যায় বোধনীয় বিল্ববৃক্ষ সমীপে গিয়া বোধনের কার্য্য হইয়া থাকে, কখন কখন দিনদ্বয় পূর্ব্বেও হইয়া থাকে। দিনদ্বয় পূর্ব্বে বোধনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে "দিনদ্বয়াৎ পূর্ব্বং বোধনে কর্ত্তব্যে 'পরশ্বঃপ্রভৃতি-কর্ত্তব্য' ইত্যুল্লেখ্যং"; অন্যথা পূর্ব্বদিনে হইলে "শ্বঃপ্রভৃতি" এই বাক্যের উল্লেখ করিতে হয়। শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া—

ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ॥
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে দেব্যাস্ত্রেণ চ তাড়িতাঃ॥

বেতাল, পিশাচ, রাক্ষস, সরীসৃপ, দেবীর অস্ত্র দ্বারা তাড়িত হইয়া দূরে গমন করুক, এই বলিয়া উহা ছড়াইতে হয়। শ্লোকান্তরে আছে যে—

দেশাদ্ অস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥

তাহারা আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া (দূর হইতে) আমাদের পূজা নিরীক্ষণ করুক। মূল পূজা-সময়ে মধ্যে মধ্যে শ্বেতসর্ষপ বিকীরণের ব্যবস্থা আছে। সর্ষপের উগ্রগন্ধে সরীসৃপাদি পূজাচত্বর হইতে পলাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাক্ষসাদি বিতাড়নের সম্ভাবনা কোথায় তাহা বুঝা যায় না। বেতাল, পিশাচ ও রাক্ষস কেন তাঁহাদের লক্ষীভূত তাহা অনিশ্চিত। পূজার মন্ত্রের ভিতরে অনেক স্থলে "ততো ভূতাপসারণং কুর্য্যাৎ" এই মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ভূতপ্রেতাদি এই শ্বেতসর্ষপ বলি দ্বারা প্রসন্ন ও প্রসাধিত হয়, ইহাই ধারণা।

যাঁহাদের বাটীতে বহুদিন হইতে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের বাটীর দালানে বা চণ্ডীমণ্ডপের অদূরে বিল্ববৃক্ষ রোপিত থাকে এবং ঐ বৃক্ষ শাখাপত্রে প্রকাণ্ড হইয়া যায়। যাঁহাদের ঐরূপ বৃক্ষ নাই তাঁহারা বিল্বশাখা লইয়া পূজার দালানের রোয়াকের উপরে গামলায় বা টবে উহা স্থাপন করেন, ঐ বিল্ববৃক্ষ বা শাখার আমন্ত্রণ-মন্ত্র এই—

ওঁ মেরু-মন্দার-কৈলাস-হিমবচ্ছিখরে গিরৌ।
জাতঃ শ্রীফল-বৃক্ষ ত্বমম্বিকায়াঃ সদাপ্রিয়ঃ॥
শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফল শ্রীনিকেতন।
নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ॥

মোটামুটি অর্থ এই;—গিরিশিখরে তোমার জন্ম, তুমি অম্বিকা বা দুর্গার সদাপ্রিয়; আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি, তুমি চল; তুমি দুর্গার স্বরূপ।

পূর্ব্বের মন্ত্রে আছে ইহাগচ্ছ * * "ওঁবিল্ববৃক্ষায় নমঃ। ইতি পাদ্যাদিভি বিল্ববৃক্ষং পূজয়েৎ।"

পরে আছে

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা গতিঃ।
অদ্য মে সফলং সর্ব্বং যস্মাৎ ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ॥
* * *
ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভূত বৃক্ষরাজ নমস্ত তে।
* * *
যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়াদি।

অর্থাৎ অদ্য আমার জন্ম সফল, কেননা আমার গতি সফল; আমার আজ সবই সফল, কেন না তুমি শঙ্কর-প্রিয়।

তাহার পরে বিল্ববৃক্ষে বা শাখায় পাদ্যাদি ও পঞ্চগব্য প্রদান করিয়া উহার স্তব করিতে হয়, এবং গন্ধপুষ্পাদি বৃক্ষকে নিবেদন করিয়া "ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ" এই মন্ত্রে উহার অর্চ্চনা করিতে হয় এবং ৭ ফের সূত্র দ্বারা উহার

---

* "প্রকৃতি" হইতে।

† এই বিবরণ হইতে অনেক ইতিহাসঘটিত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তঃ সং।

কাণ্ডচতুষ্টয় বেষ্টন করিতে হয়। তাহার পরে নবপত্রিকা যোজনা করিতে হয়। ঐ নবপত্রিকা হইতেছে—

রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ।
অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যাদি নবপত্রিকাঃ॥

এখানে রম্ভা অর্থে কদলী (পত্র সহিত কলাগাছ), কচ্চী অর্থে কচু (পত্র সমেত), হরিদ্রা অর্থে হলুদ গাছ (পত্র সমেত), জয়ন্তী, বিল্ব অর্থে বেলগাছ, দাড়িম লৌকিক ভাষায় ডালিম, অশোক, মানক অর্থে মানকচু (পত্র সমেত), ধান্য (অঙ্কুরোদ্গত পত্র সমেত) ধান-গাছ, ইহাই নবপত্রিকা। তাহার পরে মৃন্ময়ীস্থানে লইয়া গিয়া নির্ম্মঞ্ছনাদি (বরণাদি) করিয়া এবং গণপতি আদি নানা দেবতাকে পূজা করিয়া এবং ভূত-দৈত্য-পিশাচের উদ্দেশে মাষভক্ত-বলি (মাষকলাই মিশ্রিত ভক্ত বা ভাত, এখানে আতপ চাউল) প্রদান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করিবে। ইহাই সংক্ষেপে অধিবাস-বিধি।

তৎপরে সপ্তমী তিথিতে যজমান বিল্ববৃক্ষ সমীপে যাইয়া শাখাকে স্নান করাইয়া তীক্ষ্ণ কাটারি যোগে উহার শাখা ছেদন করেন। ছেদনের মন্ত্র হইতেছে ওঁ ছিন্দি ছিন্দি ফট্ ফট্ স্বাহা। তাহার পরে পুটাঞ্জলি পূর্ব্বক পাঠ করিতে হয় * *

নেতব্যোঽসি 'ময়া' গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ।

আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি, চল; আমি তোমাকে দুর্গাস্বরূপে পূজা করিব।

বিল্বশাখাং সমারুহ্য শ্রিয়ং রাজ্যং প্রযচ্ছ মে।

তুমি বিল্বশাখায় আরোহণ করিয়া আমাকে শ্রী ও রাজ্য প্রদান কর। তোমার শাখাচ্ছেদন জনিত যদি কষ্ট হইয়া থাকে,

ক্ষন্তব্যং বিল্ববৃক্ষেশ বিল্ববৃক্ষ নমোঽস্তু তে।

হে বিল্ববৃক্ষেশ! আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজাং করোম্যহং।

আমি তোমার শাখা লইয়া দুর্গাপূজা করিব।

ওঁ উত্তিষ্ঠ বরদে দেবি সর্ব্বকল্যাণ-হেতবে।

হে সর্ব্বকল্যাণের কারণরূপা, তুমি উত্থান কর এবং আমাদের সকলের পূজা গ্রহণ কর।

তাহার পর ফলযুগলযুক্ত বিল্বশাখা গ্রহণ করিয়া নবপত্রিকার সহিত একত্রিত করিয়া আসনে স্থাপন করিবে।

তাহার পর জলপূর্ণ ঘটে নবপত্রিকার স্নানের ব্যবস্থা; এবং নবপত্রিকার প্রত্যেকের স্বরূপের বর্ণনা। কদলী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তুমি বিষ্ণুভক্তা পার্ব্বতী এবং তুমি রম্ভারূপধরা, তুমি সুরার্চ্চিত অর্থাৎ দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা। কচুর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তুমি স্থাবররূপা ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। তুমি দুর্গারূপে আমাকে বিজয় দান কর। হরিদ্রা, তুমি রুদ্ররূপা এবং সকলের প্রিয়; তুমি বৃক্ষরূপে আমাকে সর্ব্বশান্তি দান কর। জয়ন্তি! তুমি জগতের জয়ের জন্য জয়রূপে আমাকে জয়দান কর, বিল্বের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তুমি শ্রীফল ও শ্রীনিকেতন। দালিম তুমি মহাদেব-প্রিয়, তুমি বৃক্ষরূপে আমাকে সর্ব্ব-শান্তি দান কর। অশোক! শোকশান্তির জন্য তোমাকে স্নান করাইতেছি, আমাকে শোকশূন্য কর। মানকচু! তোমাকে সুরাসুর সকলেই মান্য করে, আমাকে মান দান কর। লক্ষ্মী তুমি ধান্যরূপা, সকলের প্রাণদাত্রী; তুমি আমার গৃহে স্থিরা হও।

ওঁ স্থিরা ভব সদা দুর্গে নবপত্রীসমাবৃতে।
সদা ত্বং পূজিতা দুর্গে স্থিরা ভব হরপ্রিয়া॥

হে নবপত্রীসমাবৃত দুর্গা, তুমি স্থির হইয়া থাক।

তাহার পরে অপরাজিতা লতায় সকলগুলিকে বেষ্টন করিয়া দিতে হয়। ইহার পরে ব্যাপক সংকল্পান্তর বিশেষ সংকল্প করিয়া সপ্তমী পূজা আরম্ভ করিবে।

এইখানেই নবপত্রিকা-প্রবেশ শেষ হইয়া গেল। নয়-টির মধ্যে রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, মানকচু ও ধান্য—এই পাঁচ দফা ঔষধি; এবং জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব ও অশোক এই চারিটি বনস্পতি। এই নয়টিকে লইয়া নবপত্রিকা। অশোক ভিন্ন আর সবকয়টি আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। অশোকপুষ্প দেখিতে সুন্দর এবং উহার পত্র ও ত্বক্ ঔষধের অঙ্গ। মানশব্দের সঙ্গে সম্মানের এবং অশোক-শব্দের সহিত শোকহীনতার যোগ আছে, তাই বুঝি নব-পত্রিকার সহিত ইহাদের মিলন। বৈদিক দেবতাতত্ত্বের ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কিছু আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় ব্যবহারের বা চিত্তবিনোদনের বস্তু তৎসমুদয়ই দেবতাপদবাচ্য; এমনকি অক্ষক্রীড়ার অক্ষ, উদূখল, মুষল ও ওষধি পর্য্যন্ত বৈদিক দেবতার অন্তর্গত। উপনিষদের ভিতরে দেখা যায়, "যঃ ওষধিষু যঃ বনস্পতিষু" অর্থাৎ যিনি ওষধি বা বনস্পতি নহেন অথচ তাহাদের মধ্যে বিরাজমান, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। দুর্গাপূজার প্রকৃত রূপ জানিতে হইলে নবপত্রিকাপ্রবেশ-রহস্য আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। অনেকে বলিতে চান দুর্গোৎসবের ভিতরে আধ্যাত্মিক রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বা উহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবপর। আমরা তাহা স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত। ওষধি-বনস্পতির ভিতরে বৈদিক সময়ের মত ভগবদ্দর্শনের চেষ্টা ইহার অন্তর্নিহিত থাকিলেও পূজক বা গৃহস্বামী ইহাকে সে ভাবে বুঝিতে আদৌ চেষ্টা করেন না। রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র যে দুর্গাপূজার সূচনা করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐরূপ মন্ত্র

যে দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে দেখা যায়, তাহা মূল বাল্মীকীয় রামায়ণ হইতে সায় পায় না। উপরে নবপত্রিকাপ্রবেশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা নিতান্ত সংক্ষেপ, সকল মন্ত্রার্থ গ্রহণ করা হয় নাই বা করিবার আবশ্যক নাই। নবপত্রিকাপ্রবেশের মোটামুটি ব্যাপার বুঝাইবার জন্য আমাদের এই প্রয়াস। বিল্ববৃক্ষের সহিত দেবীর ঘনিষ্ঠতম যোগের ব্যাপার রহস্যময়। এই নবপত্রিকা প্রবেশ হইতে অন্তত এইটুকু বুঝা যায় যে, দুর্গার মূর্ত্তিকল্পনা তখনও পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, উহা পরবর্ত্তী সময়ে সংযোজিত। আর একটি কথা, নবপত্রিকা-প্রবেশে এই বিল্ববৃক্ষ বা বিল্বশাখাকে প্রাধান্য দান করা হইলেও এবং "পুজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ" এই কথার উল্লেখ থাকিলেও উহার মধ্যে একটি সমন্বয়ের ভাব রহিয়াছে। বিল্ববৃক্ষের সহিত আর আটটি ওষধি ও বনস্পতির সমাবেশ। হইতে পারে নবপত্রিকার প্রত্যেকটি বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিভিন্ন ভাবে দেবতারূপে পরিলক্ষিত হইত কিন্তু নবপত্রিকাপ্রবেশে প্রত্যেকটিকে মর্য্যাদা দান করিয়া সকলকে একীভূত করা হইয়াছে, কাহাকেও অবহেলা বা উপেক্ষা করা হয় নাই। তখনকার দিনে এই ভাবে প্রচলিত ধর্ম্মকে এক সার্ব্বভৌমিক আকার দান করা হইল; এবং পরস্পরের মিলনের পথ সুগম করা হইল, ইহাই আমাদের ধারণা। এই নবপত্রিকাপ্রবেশের ভিতরে আমরা প্রাচীন যুগের এক সময়ের ধর্ম্মের ও ধর্ম্মচিন্তার চিত্র দেখিতে পাই, যাহা বর্ত্তমান সময়ের ঠিক উপযোগী না হইলেও প্রাচীনত্ব হিসাবে মূল্যবান্।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

(শ্রীললিতমোহন দাস এম-এ)

[৩০এ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সাধারণব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিবৃতির মর্ম্ম]

প্রাণ ব্রহ্মপদে হ'ক কার্য্যে তাঁর
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।

শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বলিখিত এই বাক্যটি তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন ঈশ্বরচরণে; আর তাঁরই প্রীতি-প্রেরণায়, তাঁরই প্রিয়কার্য্যবোধে দেশের ও মানবের নানা ভাবে সেবা করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক; তিনি জীবনের এক নূতন আদর্শ প্রচার করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন; তিনি এদেশের বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্ত্তক; ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে প্রধান সহায়; সমাজসংস্কারে অগ্রণী; রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রধান আন্দোলনকারী; তিনি একাকী দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণে অধিক ব্রতী ছিলেন; কিন্তু সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল ব্রহ্মোপাসনা—'ভাব সেই একে' তিনি এক অদ্বিতীয় নিরাকার সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক পূজা নিজ জীবনে ও দেশে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন এবং ঈশ্বরপ্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই দেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধনে ব্রতী হন। তাঁহারই আদর্শ অবলম্বন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জীবন নিয়মিত করিলেন; এবং রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"—এই মহাবাক্যে প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য প্রচারক ও আচার্য্যগণও এই আদর্শ জীবনে ও দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য্য শিবনাথও সেই আদর্শ জীবনে গ্রহণ করিলেন এবং প্রাণ ব্রহ্মচরণে রাখিয়া জীবন মন শক্তি অর্থ দিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন।

ভগবান এক-একটী জীবন অবলম্বন করিয়া এক একজনকে ডাকেন। কেহ সে ডাক শোনে, কেহ শোনে না। শিবনাথের পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁহার পিতা তাঁহার প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে বাধ্য করেন। কাজটা খুব অন্যায় হইতেছে বুঝিয়াও কঠোরপ্রকৃতি পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁর প্রাণে এই অন্যায় কার্য্যের জন্য তীব্র অনুশোচনা উপস্থিত হইল, কিছুতেই প্রাণে শান্তি পান না। তখন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের উপদেশে ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে প্রাণে শান্তি আসিল। এই যে তিনি ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, আর জীবনে তাঁহাকে ছাড়িলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থা জন্মিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কেবল তাহা নয়, ব্রহ্মের উপাসনাই যে মানবের একমাত্র সম্বল, ব্রাহ্মধর্ম্মই যে একমাত্র সত্যধর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারিয়া আপনার সুখ, স্বার্থ, খ্যাতি ও যশ—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে, ঈশ্বরের নামের মহিমা প্রচারে ব্রতী হইলেন। চৈতন্যদেব যেমন বলিয়াছিলেন," লোকের পায়ে ধরি ভজাইব হরি" আচার্য্য শিবনাথেরও জীবনের ব্রত হইল—মানবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া মধুর ব্রহ্মনাম প্রচার করিব। তিনি সাহিত্যসেবা, শিক্ষাদান, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক উন্নতি প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যেই অল্লাধিক পরিমাণে লিপ্ত ছিলেন; ঈশ্বরের প্রীতি-প্রেরণায় তাঁরই প্রিয়কার্য্যবোধে দেশের কল্যাণকার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ ছিল দেশে দেশে ব্রহ্মের নাম প্রচার করা।

তিনি দরিদ্র ছিলেন, ইচ্ছা করিলে ধন উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেন, দেশে

সমাজে মান-প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু সমস্ত পায়ে ঠেলিয়া ঈশ্বরের নামপ্রচারে জীবন-মন অর্পণ করিলেন, দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন।

(১) তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "শাস্ত্রী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষাকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তিনি হইতেন, কিন্তু ঈশ্বরের ডাক আসিল, সে বাণী তিনি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেই কবিতায় লিখিয়াছেন:—

শোনরে শোনরে তাঁর বাণী
মধুর আহ্বান রে।

* * *

যে বাণী পরশ পেয়ে নরনারী আসে ধেয়ে
সঁপিবারে জীবন যৌবন।

তাই তিনিও ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া তাঁর নামপ্রচারে জীবন যৌবন অর্পণ করিলেন, দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন। তাই তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

আয় তবে আয় মোর দরিদ্রতা,
রুধির-শোষিণী পৈত্রিক দেবতা
আয় বজ্রধ্বনি আয় কালজয়ী
নরশক্র যারা আয় সবে তোরা
ঘের আসি চৌদিকে করিয়ে জনতা।

আবার লিখিয়াছেন—

আমি বড় দুঃখী তাহে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করি, সুখী হতে চাই;
আপনি কাঁদিব কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি এই ভিক্ষা চাই।

তিনি কার্য্য ত্যাগ করিলেন, আর তিন মাস থাকিলে একটা বোনাস্ পেতেন, তাহার প্রলোভনও তাঁহাকে রাখিতে পারিল না। পিতামাতা কত আশা করিয়াছিলেন, তাঁর নিজেরও সুখ হইত, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ পাইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন, ব্রহ্মের ডাকে সব ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইলেন, তাঁর নামপ্রচারে ব্রতী হইলেন।

(২) তিনি সুকবি ছিলেন; বাংলা সাহিত্যে অগ্রণী ছিলেন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেই যদি নিজের শক্তি নিয়োগ করিতেন, তবে অর্থও হইত, এবং দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের আহ্বানে সে অর্থ ও প্রতিপত্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিলেন।

(৩) তিনি বাল্যকাল হইতেই সমাজসংস্কারক ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অনুপ্রাণনা পাইয়া বিধবাবিবাহপ্রচলনে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁর বন্ধু ৺যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ দিয়া তাঁর পরিবারপ্রতিপালনের জন্য নিজের বৃত্তির টাকা ব্যয় করিয়াছেন, শারীরিক কত পরিশ্রম করিয়াছেন। জাতিভেদ দূর করিবার জন্য, নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রদান জন্য, বাল্যবিবাহ রহিত করা, প্রভৃতি সমাজসংস্কার কার্য্যেই আজীবনই তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যদি সমগ্র হৃদয়-মন এই সমাজসংস্কার কার্য্যেই দিতেন, তাহা হইলে কত প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন কিন্তু এসব কাজ তিনি আজীবন করিলেও প্রধান কাজ ছিল তাঁর ঈশ্বরের নাম প্রচার করা।

(৪) রাজনীতিক আন্দোলনেও তাঁর প্রাণের সহানুভূতি ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের সঙ্গে মিলিত হইয়া তিনি ভারত-সভা (Indian Association) স্থাপন করেন; দেশের রাজনীতিক স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায় তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করার পর রাজনীতিক আন্দোলনে তিনি বেশী যোগ দিতে পারিতেন না; তবুও তাঁর মনপ্রাণ সেদিকে ছিল। বঙ্গ-বিভাগজনিত বেদনায় পীড়িত হইয়া বঙ্গবাসী যখন "স্বদেশী আন্দোলন" আরম্ভ করিল, তখন সেই ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ বিভাগের দিনে তিনি দার্জ্জিলিং ছিলেন; সেখানে প্রতিবাদসভায় তিনি সভাপতির কাজ করেন। আর সেই ১৯০৮ সালে প্রীতিভাজন কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নয়জন রাজনীতিক বিনা বিচারে ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে নির্ব্বাসিত হন, তখন এই নির্ব্বাসনের প্রতিবাদসভাতে রাজনীতিক নেতাদের ভিতরেও আর কাহাকেও সভাপতির কাজ করিতে পাওয়া গেল না! সুরেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি শাস্ত্রীমহাশয়কে ধরি, তিনিই গিয়া সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং সেই প্রতিবাদ সভার সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তখন লোক ভয়ে অস্থির; কিন্তু তিনি অকুতোভয়। তাঁর রাজনীতিক মত ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি তখন —সেই বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময়—অসুস্থ হইয়া ডাঃ মোহিনীমোহন বসুর বাড়ীতে আসেন। তাঁহার রাজনীতিক মত জানিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হইল। তিনি বলিলেন, শাসন কার্য্য তিন প্রকার হইতে পারে; (১) Benevolent Despotism শুভাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত একতন্ত্র শাসন; (২) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এখন যাহাকে বলা হয় Dominion status (৩) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—Complete Independence; এর প্রথম রকম এখন চলিতেছে উহা আমরা চাই না। দ্বিতীয় রকম—ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র,

উহারা আমাদের দিবে না। সুতরাং আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। এই রাজনীতিক্ষেত্রে যদি তিনি থাকিতেন, তাঁর মত সুবক্তা, সুবিবেচক, নির্ভীক, ত্যাগী পুরুষ এক্ষেত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে সম্মান পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নাম প্রচারে ব্রতী হইলেন।

তাই যদি জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেশের নানা প্রকার মঙ্গলকার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল—ঈশ্বরের নাম প্রচার; "লোকের পায়ে ধরি, ভজাইব হরি" "প্রাণ ব্রহ্ম পদে, হস্ত কার্য্যে তাঁর"—এই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এর জন্য সারাজীবন খাটিয়া গিয়াছেন; সমস্ত ধন সম্পদ যশঃ মান পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নাম সাধন ও দ্বারে দ্বারে প্রচারে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্ম। *

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আর্য্যজাতি।

"ঋগ্বেদ সংহিতার পুরাতন অংশে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, আর্য্যেরা হিন্দুস্থানের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে—পঞ্জাব কাশ্মীর এবং পঞ্জাব ছাড়াইয়া কুভানদীর তীরে বসতি করিয়াছিল। এই সকল আড্ডা হইতে সরস্বতী নদী পার হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বভাগে হিন্দুস্থানের মধ্যে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত তাহাদিগের বিস্তার হইবার বিষয়, তাহারা স্তরে স্তরে চিহ্ন বৈদিক গ্রন্থের শেষ অংশসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুরাণ হইতে এই জেতৃজাতির পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম এবং দক্ষিণাঞ্চলে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার জানিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই অসীম ভারতখণ্ড, যাহা তখন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং বলবান বন্যজাতির বাসস্থান ছিল, তাহাকে হিন্দুধর্ম্মে আনিতে কত শতাব্দী গত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, যে, উহার প্রথমাবস্থায় উহা এতটা প্রাচীন, যে তখন আর্য্য এবং পারসীক সব একত্র মেশামেশিরূপে বাস করিত। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর পাহাড়ীয়া যেমন এক জায়গায় বাস করিলেও আলাদা আলাদা দলে বাস করে তেমনি আর্য্যজাতি ও পারসীক প্রভৃতি জাতি একত্র থাকিলেও তাহাদের মধ্যে দলের প্রভেদ ছিল।

দেবতা।

আবার ঋগ্বেদের ভাব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যদিগের সতেজ ভাবটা প্রকৃতির সম্বন্ধে সহজ উচ্ছ্বাসে টাটকা টাটকা রকমে নবীনভাবে ছেলেমানুষী ভাবে বাহির হইতেছে। আর্য্যেরা প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ডরূপে দেবতা বলিয়া পূজা করিত, স্বতন্ত্র দেবতার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির আয়তন কল্পনা করিয়া সেই সেই আয়তনের মধ্যে তাহাদের বন্ধুত্ব এবং সাহায্য প্রার্থনা করিত। এই প্রকৃতি পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতির প্রত্যেক আবির্ভাবকে (Phenomenon অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতা জ্ঞান করিত। যত ধর্ম্ম মনুষ্যের মনে উদয় হইতে পারে হিন্দুধর্ম্মে সে সব হইয়া গিয়াছে;

প্রত্যেক প্রকৃতির আবির্ভাব যাহা প্রথমে কল্পনাতে অলৌকিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে যে যেখানে প্রকাশ পায়, সেই ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বা মণ্ডলে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল এবং তাহাদিগের সকলের মধ্যে একটা সাদৃশ্য প্রকাশ পাইল। এইরূপে কতকগুলি দেবতা কল্পনা করিয়া এইলে তাহারা যেন আপনাপন এলাকায় প্রত্যেকে একাধিপত্য করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অধিকার মনুষ্য-জীবনের ঘটনাসমূহে বিস্তার হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে আবার মনুষ্যের স্বরূপ ও অবয়বরাজিও দেবতা-দিতে অর্পিত হইয়া পড়িল। স্বাভাবিক বলের প্রতিভূ-স্বরূপ এই সকল প্রকৃতিদেবতা অনেকগুলি হই-লেও তাহাদিগের আবার পিতামাতা স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি কল্পিত হইয়া দেবতাদিগের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আবার এই সকলে দৈবশক্তি, ব্যক্তিগত সত্তা ও ক্রিয়া আরোপিত হইল। পরে যখন আলোচনার কাল আসিল, তখন ঐ বহুবিধ দেবতাদিগের মধ্যে, তাহাদের মোটামুটি ভাব অনুসারে, থাকবন্দি করিয়া একটা শৃঙ্খলা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। যেমন দ্যুলোকের দেবতা অন্তরীক্ষের দেবতা পৃথিবীর দেবতা সূর্য্য, ইন্দ্র ও অগ্নি ঐ ঐ স্থানের প্রধান প্রতিভূ ও শাসিতা বলিয়া গণিত হইল। এই তিন দেবতা ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেবতার উপরে পদ পাইল—অন্য দেবতারা যেন ইহাদিগের আশ্রিত ও ভৃত্যভাবে রহিল।

যখন একবার এই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পাকা হইয়া দাঁড়াইল, তখন আবার আলোচনা আন্দোলন ও এই তিনের আপেক্ষিক সম্বন্ধ (relative position) নির্ণয় করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রধান দেবতা যে ব্রহ্ম তাঁহাতে গিয়া একতা পাইল। তখন এই তিন আবার ব্রহ্মের সৃষ্ট ও ভৃত্য হইয়া দাঁড়াইল। অথবা এই তিনের যখন যাহাকে পূজা করিত তখন তাহাকেই সর্ব্বপ্রধান দেবত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিত। সূর্য্য দেবতাই যেন

---

* Weber's History of Indian Literature
ইংরেজি অনুবাদ।

সর্ব্বপ্রথমে প্রধানতম পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন বোধ হয়। পারস্য-আর্য্যের মধ্যে সূর্য্যই অধিদেবতাতে স্থিতি করিতেছে। আর অবর্ত্তের সমকালীন আমাদের ব্রাহ্মণেতেও সূর্য্যদেবতাকে সর্ব্বোচ্চ পদ দিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; সূর্য্যকে বলিয়াছে "প্রসবিতা দেবানাং।" গায়ত্রীতেও দেখিতে পাওয়া যায়—যদিও তাহার এখন ব্রাহ্ম অর্থ ঘটান হইয়াছে—যে সূর্য্য পৃথিবী দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষব্যাপী, যেহেতু সূর্য্য আপন কিরণ দ্বারা সকল লোক উজ্জ্বল করিতেছে, কিরণ দ্বারা সে সকল লোকে ব্যাপ্ত আছে। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি" 'সেই সবিতার কিনা জগৎপ্রসবিতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি যিনি আমাদিগকে ধী কিনা সদ্বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞাসকল প্রেরণ করিতেছেন।' যখন ধী'র কথা উঠিয়াছে তখন সময় অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এখনো সৌর বলিয়া এক মতাবলম্বী আছে, যাহারা সূর্য্যকে দেখিয়া প্রত্যহ নমস্কার করে। এক্ষণে সূর্য্যদেবতার অত আধিপত্য নাই। সূর্য্যদেবতা যেন ব্রহ্মারূপে কল্পিত হইয়াছে। পৃথিবীর এবং আকাশের দেবতারা, মনুষ্যের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ থাকাতে, ক্রমে প্রধান পদ অধিকার করিয়া লইল। নানা প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর রুদ্র অগ্নির স্থলাভিষিক্ত হইল, আর বিষ্ণু ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত হইল।

চতুর্ব্বেদ।

বেদ চার; ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, (যজুর্ব্বেদের দুই শাখা, কৃষ্ণ যজু আর শুক্ল যজু) এবং অথর্ব্ব বেদ। এই এক একটা বেদের আবার তিন তিনটা ভাগ:—সংহিতা ভাগ, ব্রাহ্মণ ভাগ এবং সূত্র। উপনিষদ বা আরণ্যক হইতেছে ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট, এইজন্য উপনিষদকে বেদান্ত বলে।

ঋগ্বেদ।

ঋক্ সংহিতা আর কিছু নয়, কেবল আর্য্যদিগের মেঠো গানের সংগ্রহ:—যে সকল গান পুরাতন বাসস্থান সিন্ধুনদীতীরে আর্য্যদিগের আপনাদের ও আপনাদের পশুসকলের ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া উষাদেবীকে আহ্বান করিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল অথবা ইন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে গীত হইয়াছিল,—(যে ইন্দ্র বিদ্যুতের দ্বারা অন্ধকারের বলকে পরাহত করেন) এবং যে সকল গান যুদ্ধে রক্ষা করিবার জন্য ও জয় দান করিবার জন্য দেবতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্যবাদে পরিপূর্ণ —

ঋগ্বেদ প্রণেতা ঋষিবংশ অনুসারে ঋক্‌সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

সামবেদ।

সোমযাগ অর্থাৎ—যে যজ্ঞে দেবতাদিগকে সোম দান করা হইত—এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি অন্যান্য যজ্ঞে, যে সকল ঋক্ গীত হইত, সেই ঋক্‌গুলি যজ্ঞে যেমন পরে পরে ব্যবহার হইত, সামবেদে সেইরূপ আনুপূর্ব্বিক ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ করা আছে। সংহিতার অর্থই সংগ্রহ করা, যাহা ছড়ান ছিল তাহাই একত্র করা। সোমপানবিষয়ক যে সকল ঋক্ ঋগ্বেদে আছে, প্রায় সেই সকল ঋক গান-আকারে সামবেদে আছে। ছন্দটা হইল ঋগ্বেদের, গানটা হইল সামবেদের। সামসংহিতার ঋকে কিন্তু ব্যাকরণের পুরাণো রকম গঠন দেখিয়া সামের ঋক্‌সমূহকে ঋগ্বেদের ঋক্ অপেক্ষা পুরাণো এবং প্রাথমিক বোধ হয়।

যজুর্ব্বেদ।

সোমযাগ এবং অন্যান্য মেধে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত, সেই সকল মন্ত্র পরে পরে যেমন ব্যবহৃত হইত তাহারই আনুপূর্ব্বিক সংগ্রহ হইতেছে যজুর্ব্বেদসংহিতা। যজুর্ব্বেদ সংহিতাদ্বয় গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত। ইহার পদ্যভাগ প্রায় ঋগ্বেদে পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়। গান এবং সূক্তসকল (hymns) যখন মুখপরম্পরায় প্রথমে চলিয়া আসে তখন অবশ্য অনেকটা অদলবদল হইবারই সম্ভাবনা; যেহেতু লিখিয়া মন্ত্রাদি ঠিক রাখা সেই আদিম কালের পক্ষে একরূপ অসম্ভব—তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। এমন কি, সংহিতার পরবর্ত্তি ব্রাহ্মণের সময়েও লেখা লিপিবদ্ধ হইত কি না সন্দেহ। তাহা হইলে ব্রাহ্মণের এত ভিন্ন শাখা হইত না এবং যে সকল মূলের ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যা আছে তাহারা পরস্পর এত বিভিন্ন হইত না।

অথর্ব্ববেদ।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের যে সময় বেশ আধিপত্য বিস্তার হইয়াছে সেই সময় অথর্ব্ব সংহিতার কাল মনে করিতে হইবে। আর আর বিষয়ে ইহা ঋক্ সংহিতারই সদৃশ এবং ইহাতে এই ব্রাহ্মণসময়কার পদ্য সংগ্রহ আছে। ইহার ভিতরের অনেক গান ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডল দশম মণ্ডলে আছে—যে অংশটি ঋগ্বেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ। দেখিলে বোধ হয়, ঋগ্বেদ যে সময় সংগ্রহ করা হইয়াছিল সেই সময় এই গানগুলাকেও তাহার মধ্যে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু অথর্ব্ববেদে তাহাদের সংগ্রহ যেন স্বাভাবিক এবং সময়োচিত ভাষণ (utterance) বোধ হয়।

ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদের ভাব বেশ ভিন্ন টের পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে একটী জীবন্ত স্বাভাবিক ভাবের উচ্ছ্বাস, প্রকৃতির প্রতি গাঢ় প্রেমের উচ্ছ্বাস স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; অথর্ব্ববেদে আর্য্যেরা ভূতপ্রেতের ভয়ে (anxious dread of evil spirits) এবং তাহাদিগের শত্রুর ভয়ে (their

magical powers) ভীত; ঋগ্বেদে তাহারা যেন স্বাধীন উদ্যমে পূর্ণ, কাহারো অধীনতা স্বীকার করিতেছে না; অথর্ব্ববেদে তাহারা যেন 'বামুন'দের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, কুসংস্কারশৃঙ্খলে যেন বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, স্বাধীনতার যেন স্ফূর্ত্তি নাই। কিন্তু অথর্ব্ব সংহিতাতেও এমন সকল সূক্ত রহিয়াছে যাহা অতি পুরাকালের বলিয়া বোধ হয়, বোধ হয় সে সকল সূক্ত আর্য্যদিগের ইতর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল; আর ঋগ্বেদের গানসকল বোধ হয় আর্য্যদিগের প্রধান প্রধান বংশের সম্পত্তি ছিল। বোধ হয় অনেক যোঝাযুঝির পর তবে অথর্ব্ব ঋকসকল চতুর্থবেদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ঋক সাম যজুর ব্রাহ্মণের পুরাণো পুরাণো অংশে ইহার কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় ব্রাহ্মণের সমকালীন অথর্ব্ব ঋক্‌সকল সংগৃহীত হইয়াছিল তাই ব্রাহ্মণের অপেক্ষাকৃত শেষ অংশে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমে তিন বেদই বিখ্যাত ছিল, পরে চতুর্বেদ হইল।

ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের সাধারণ ভাবটা এই ঃ—যজ্ঞের গান ও মন্ত্রকে যজ্ঞক্রিয়ার সহিত সংলগ্ন করা, উহাদিগের মধ্যে যোগ স্থাপন করা। ইহা "ব্রাহ্মণ" করিয়াছে। এইজন্য ব্রাহ্মণে যজ্ঞের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ এক এক যজ্ঞে যেখানে যে গান যে ঋক্ যে মন্ত্র প্রয়োজন, সেইটা আনুপূর্ব্বিক ব্রাহ্মণে দেখান হইয়াছে —বৈদিক ভাষার অর্থবিন্যাস করা হইয়াছে। আর্য্য-দিগের মধ্যে যে সকল প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে এবং পুরাণো পুরাণো উপাখ্যান যে সব প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণে সে সকল সংগৃহীত হইল, আর উহাতে সে সময়কার তত্ত্ববিষয়ক মতামত সকলও ব্যক্ত হইল। আর্য্যভাব ও আর্য্যসভ্যতা হইতে ব্রাহ্মণ অথবা হিন্দুভাব ও হিন্দুসভ্যতায় পরিবর্ত্তনের সময়টায় ব্রাহ্মণকল্পের আবির্ভাব; এমন কি বলিলেও হয় যে 'ব্রাহ্মণ'দ্বারা এই পরিবর্ত্তনটি ঘটিয়া উঠে। কতক ব্রাহ্মণ এই কল্পের আদিতে, কতক ব্রাহ্মণ এই কল্পের শেষে রচিত বলিয়া বোধ হয়।

বিশেষ বিশেষ প্রাজ্ঞ ঋষির মত যাহা মৌখিক প্রবাদরূপে প্রচলিত হইয়া এবং শিষ্য ও বংশপরম্পরায় বিস্তৃত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল তাহা হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। যখন একই প্রবাদ নানা মুখে নানা আকার ধারণ করিতে লাগিল, তখন সেই নানারূপ প্রবাদকে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিবার প্রয়োজন হইল। এই উদ্দেশে সময়ে সময়ে, নানা বিষয়ের নানা প্রকার মত যে স্থানে স্থানে প্রস্তুত হইয়াছিল, এক এক স্থানের পারগ ঋষিসকল সেই সেই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া, যে ঋষি হইতে যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে সব ধরিয়া দিতে লাগিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে যেগুলা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইল অথবা যেগুলা সে সময়কার ভাবকে অধিক পোষণ করিল, তাহারাই পাঠ্য হওয়াতে সেইগুলিই এখন পাওয়া যায় অন্যগুলি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। মতামত সম্বন্ধীয় পুস্তকসকলও এইরূপ; যে মত জয়যুক্ত হইয়াছিল তাহাই বিরোধী অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকের পরিবর্ত্তে রহিয়া গিয়াছে। এইরূপে আমাদের কত পুস্তক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে বিষয়গত এই স্বতন্ত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়;—ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে যখন যজ্ঞবিষয়ে বক্তব্য বলে তখন হোতার বা ঋকপাঠকের যাহা কর্ত্তব্য সেইটুকুই বলে। হোতার কর্ম্ম—যে যে ঋক যে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের উপযোগী সেই সেই ঋক বাছিয়া লইয়া সেই সেই বিশেষ যজ্ঞে ব্যবহার করা। সেই যজ্ঞে সেই সকল ঋকের ব্যবহার বিধিবদ্ধ হইত। সামবেদের ব্রাহ্মণে উদ্গাতা বা সামগায়কদিগের যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুরই সম্বাদ আছে। তেমনি যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে অধ্বর্য্যু বা কর্ম্মীদিগের কর্ত্তব্যটুকু বিবৃত আছে। ঋকের ব্রাহ্মণে যজ্ঞেতে যেমন পরম্পরায় ঋকের ব্যবহার, সেইরূপ আনুপূর্ব্বিক ভাবে আছে; ঋক সংহিতাতে যে পরম্পরা আছে তাহা ইহাতে নাই। কিন্তু সাম ও যজুর্ব্রাহ্মণে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয়েতেই সমান পরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়, যেহেতু সাম ও যজুর্ব্বেদের সংহিতা যজ্ঞপ্রণালী অনুসারেই গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছিল। ঋগ্বেদের ঋক্ সকল সূক্তরচয়িতা ঋষি অনুসারেই সংহিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণের সাধারণ নাম হইতেছে শ্রুতি কিনা শোনা অর্থাৎ বিশেষ করিয়া শুনিবার বিষয় বা শিখিবার বিষয়। নামের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ ইতর সাধারণ লোকদিগের জন্য নহে, কিন্তু তখনকার শিক্ষিতদিগের জন্য উন্নত ব্রাহ্মণদিগেরই জন্য। ব্রাহ্মণের মধ্যে যদিও শ্রুতিশব্দ আপনাতে প্রয়োগ করে নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী সূত্রে ব্রাহ্মণকে শ্রুতি বলিয়া বলিয়াছে।

সূত্র।

ব্রাহ্মণসাহিত্যের পরে সূত্র সাহিত্য আসিল। ব্রাহ্মণরূপ মূলপত্তন হইতেই ইহারা উত্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে যে পথ প্রদর্শিত হইল, সেই পথ ধরিয়া আরো ইহারা অগ্রসর হইল—প্রণালীকে তন্ন তন্ন করিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়া গেল। সেই জন্য ইহাকে

ব্রাহ্মণের বিস্তৃতি (supplement) বলিলেও বলা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণ যখন বহুবিস্তৃত হইল, বিষয় যখন মেলা হইয়া পড়িল যখন গ্রন্থ পড়িতে গিয়া কোনটাই আয়ত্ত হয় না, এক একটা বিষয় বহুবিস্তৃত ব্রাহ্মণের নানাস্থানে ছড়াইয়া থাকায় কোন একটা বিষয় আলোচনা করিতে গেলে যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ না পড়িলে আর চলে না, যখন ইহাতে শিক্ষার বড় ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তখন এক একটী বিষয় 'লাগডাউট'রূপে আদ্যন্ত জানিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা সূত্রসাহিত্যের অবতারণা করিলেন। এক একটী বিষয় লইয়া যত বাহুল্য আন্দোলন হইয়াছিল কতকগুলা সূত্র করিয়া সবটা সাররূপে সংক্ষেপের মধ্যে একটুর মধ্যে গাঁথিয়া দিলেন। রাশীকৃত আন্দোলনকে যতটা সংক্ষেপে করা যাইতে পারে যাহাতে স্মরণের আয়ত্ত হইতে পারে এমন ভাবে সূত্র সব প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে যত দিন যাইতে লাগিল এবং সূত্রসাহিত্য ব্রাহ্মণভাগের উপর নির্ভর না করিয়া যত স্বতন্ত্র ভাবে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল এবং সূত্রের উপকারিতা যত হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, তত সূত্রের উন্নতি সাধন হইয়া হইয়া এমনি ঠাসাভাবে ও সংক্ষেপে লিখিত হইতে লাগিল যে গুরূপদেশ ও টীকা ব্যতীত তাহা একেবারেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। তখন সেই সূত্রগাঁথনি খুলিতে আবার রাশি রাশি পুস্তক তৈয়ারি করিতে হইয়াছিল। যে সূত্রগ্রন্থ যত পুরাণ তত বোধগম্য, যত আধুনিক, তত দুরূহ।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

কেন ?

রাগিণী সিন্ধু—তাল তেওরা।

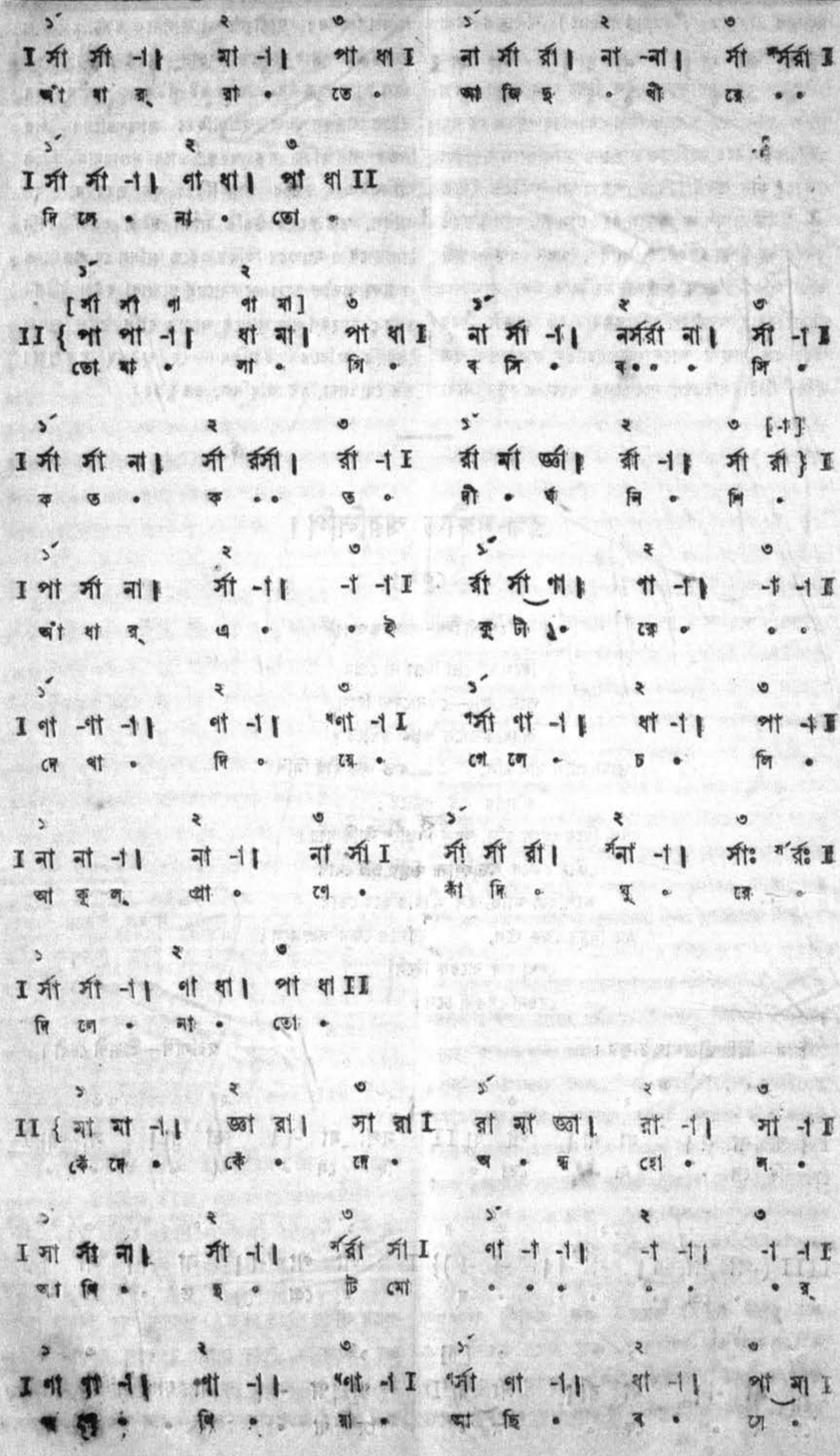
দিলে না তো দিলে না প্রেম
তবে কেন—কেন দেখা দিলে
আঁধার রাতে আজি দুখীরে ?
তোমা লাগি বসি বসি, কত কত দীর্ঘ নিশি
আঁধার এই কুটীরে ;
দেখা দিয়ে গেলে চলি, আকুল প্রাণে কাঁদি ঘুরে।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হোল আঁখি দুটি মোর
অপেখিয়া আছি বসে আঁধার হবে ভোর
এত নিঠুর কেন হলে, ভাসাও কেন অশ্রুজলে ;
দেখা যদি বারেক দিলে
যেওনা যেওনা চলে।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I { ণা ণা -া । ধা ণা । পা ধা II মপা মা -া । জ্ঞা রা । সা রা I
দি লে ॰ না ॰ তো ॰ দি ॰ লে ॰ না ॰ ॰ ॰

১´ ২ ৩ ॥ ১´ ২ ৩
IIII (পা পা -া । -া -া । -া -া)} I পা পা -া । না -া । র্সা -া I
॰ প্রে ॰ ॰ ॰ ॰ ম্ ॰ প্রে ম্ ত ॰ বে ॰

১´ ২ ৩ [ণা] ১´ ২ ৩
I না র্সা -া । না র্রা । র্সা ধা I ণা ণা -া । ণা ধা । র্ণা -া I
কে ন ॰ কে ॰ ন ॰ দে খা ॰ দি ॰ লে ॰



১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I মা মা ণা। ণা ধা। পা মা I মপা -া -া। -া -া। -া -া } I

আঁ ধা র্ হ • রে • তো • • • • • র্

১ ২

[র্সা র্স ণা ণা] ৩ ১´ ২ ৩

I { পা পা -া। ধা মা। পা ধা I না র্সা -া। র্রর্সা না। র্সা -া I

এ ত • নি • ঠু র্ কে ন • হ • • লে •।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ [-া]

I র্সা র্সা না। র্সা র্রর্সা। র্রা -া I র্রা র্মা র্জ্জা। র্রা -া। র্সা র্রা } I

জা না ও কে • • ন • অ • শ্রু জ • লে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I পা র্সা না। র্সা -া। র্সনর্সা র্রা I র্সা র্সা ণা। ণা -া। ণা ধা I

দে খা • য • দি • • বা রে ক্ দি • লে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I মা মা ণা। ণা -া। ণর্সা ণা I -া ধা পা। মপা পা। -া -া I

বে ও • না • যে ও • না • চ লে • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I মপা মা -া। জ্ঞা রা। সা রা I রপা মা -া। জ্ঞা রা। সা রা IIII

দি • লে • না • তো • দি লে • না • • •

পথের সন্ধান।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

ত্যাগানুক্রমের ঝড় অবসান হইয়া ক্রমে আকাশ নির্ম্মল, মেঘমুক্ত হইল। ত্যাগের প্রথম আস্বাদে গৌতম স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় নিরন্তর আনন্দে মগ্ন হইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সপ্তদিবস উত্তীর্ণ হইয়া গেল—আহার বিহারের চিন্তামাত্র তাঁহার মনে উদয় হইল না।

অষ্টম দিবসে তাঁহার বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল; স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া আম্রবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে এক তাপসাশ্রম দর্শন করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। এই আশ্রমনিবাসী তপাচার্য্যগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তপশ্চরণ করিতে তাঁহার অভিলাষ জন্মিল। তিনি আচার্য্যগণকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের মতে দুইটি প্রণালী আছে। এক প্রণালী অবলম্বন করিলে জাগতিক ঐশ্বর্য্যলাভ, এবং অপর প্রণালী দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। সিদ্ধার্থের নিকট এতদুভয়ই তুল্যজ্ঞান হইল। তিনি ভাবিলেন—"ইঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য মন্দ নহে, নীচ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইঁহারা উচ্চতর ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তদনুষ্ঠিত যাবতীয় কঠোরতার ফলস্বরূপ এরূপ বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিবে যাহা লাভ করিলে সর্ব্বকামনার নির্ব্বাণ হয়। মনই শরীরকে চালিত করে, অতএব চিন্তাকে সংযত করিতে হইবে। আহার্য্যবিচার ও পূতসলিলে অবগাহন দ্বারা কোন ফল হয় না। জল, জল ব্যতীত অপর কিছুই নহে; পুণ্যাত্মার পুণ্যে অবগাহনই প্রকৃত তীর্থক্রিয়া।"

গৌতম আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। রাজগৃহে পৌঁছিয়া তিনি নগরপ্রান্তে পাণ্ডবশৈলে আপন আবাসস্থান স্থির করিলেন। ভিক্ষার্থে প্রতিদিন তাঁহাকে নগরে বাহির হইতে হইত। নগরবাসিগণ তাঁহার অপরূপ দেহকান্তি, দিব্য সৌম্য মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। যথাক্রমে পারিষদ্‌প্রমুখাৎ মগধরাজ এই অনন্যসাধারণ ভিক্ষুর সংবাদ অবগত হইলেন॥

একদিন ভিক্ষার্থে বাহির হইলে প্রাসাদশিখর হইতে বিম্বিসার তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। অন্যান্য রাজগৃহবাসিগণের ন্যায় তাঁহারও মনে হইল বুঝি বা ইনি মনুষ্যবেশধারী কোন দেবতা। তিনি অমাত্যগণকে ভিক্ষুর অনুসরণ করিতে এবং তৎসম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। অমাত্যগণ ভিক্ষুর নিবাসস্থলের সংবাদ আনিলে, বিম্বিসার স্বয়ং তথায় মহাপুরুষ দর্শনে গমন করিলেন।

ভিক্ষুর পরিচয় পাইয়া, তিনি রাজপুত্রকে এই কঠোর জীবন হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। গুণমুগ্ধ রাজা গৌতমকে অর্দ্ধেক রাজ্য ভাগ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। গৌতম রাজঅনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া অনতিবিলম্বে রাজগৃহে লব্ধ জ্ঞান প্রচার করিতে আসিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া বিম্বিসার প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

বৈরাগ্যবান নবীন ভিক্ষু লোকসমাগম পছন্দ করিতেন না। এই স্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। তাপস আলার-কালামের * আশ্রমে গমন করিয়া তিনি কিছুকাল তদুপদেশে তপশ্চর্য্যায় নিরত রহিলেন। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে আলার-কালামের সিদ্ধান্ত গৌতমের মনঃপূত হইল না। অতঃপর তিনি আচার্য্য উদ্রকের † আশ্রমে গমন করিলেন। কিন্তু ইঁহার মতও তাঁহার মনঃপূত হইল না। নির্ব্বাণকাম গৌতম অবশেষে উরুবেলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উরুবেল গ্রামে বহু সন্ন্যাসী যোগী সাধনাবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। এককালে এই গ্রাম সন্ন্যাসিগণের উপনিবেশস্বরূপ ছিল। তৎকালে নিয়ম ছিল কোন ত্যাগী ভ্রাতার মনে কোন কুচিন্তার উদ্রেক হওয়া মাত্রই তাহাকে নিকটস্থ নিরঞ্জনা নদীতে অবগাহন করিতে হইবে এবং নদীর তলদেশ হইতে প্রতিবারে এক এক মুষ্টি বালুকা স্বীয় ঝুলিতে পূরিয়া রাখিতে হইবে। পরে যখন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সাময়িক অধিবেশন বসিত, তখন অন্যায়কারী ভিক্ষুর সমস্ত কুচিন্তাদি প্রকাশ করিয়া বলিতে হইত এবং তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তক্রিয়ার তিনি যে যথারীতি অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ঝুলির বালুকারাশি সকলের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতেন। ধীরে ধীরে যখন গ্রামখানি বালুময় হইয়া উঠিল তখন ইহার নাম হইল উরুবেলা। ‡

সাধনার এই পুণ্যভূমে গৌতন তপস্যা করিতে মনস্থ করিলেন। প্রব্রজ্যা অবলম্বনের পর কৌণ্ডিন্য * তাঁহার চারিজন সঙ্গীসহ নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া এই সময়ে এইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। গৌতমের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। গৌতম পূর্ণোৎসাহে কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পাঁচজন সঙ্গী সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। নির্ব্বাণের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা গৌতমকে দিন দিন উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। তিনি কঠোরতার মাত্রা ক্রমেই বর্দ্ধিত করিয়া চলিলেন। আহারের পরিমাণ কমাইতে কমাইতে ক্রমে কণামাত্রতে আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গীগণ প্রত্যহই মনে করিতে লাগিলেন, 'আজই গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।' কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহার দেহকান্তি অন্তর্হিত হইয়া শীর্ণ দেহ শীর্ণতর হইতে লাগিল। তাঁহার সমুদয় বুদ্ধ-লক্ষণ অন্তর্হিত হইল। ক্রমে আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। ধ্যানান্তে এক নিশার তৃতীয় যামে উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন। দেবগণ ভাবিলেন, গৌতমের দেহান্ত হইল। বহুক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পর ধীরে ধীরে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। গৌতম স্থির হইয়া বসিলেন, ভাবিলেন, 'অসার এই কঠোরতা। এইরূপে দেহক্ষয় করিলে নির্ব্বাণ লাভ হইবে না।' ভিক্ষাপাত্র হস্তে তিনি ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। নিয়মিত আহারাদি করায় ধীরে ধীরে তাঁহার অঙ্গকান্তি ফিরিয়া আসিল। গৌতমের পতন হইল ভাবিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে সঙ্গীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমাগত ষষ্ঠবৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া দেহক্ষয় মাত্রই সার হইল দেখিয়া গৌতম বড়ই মনস্তাপ পাইলেন। শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া তিনি এক একবার নিজের উপর নির্ম্মম হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আবার পরক্ষণেই শরীরকে দুঃসাধ্য নির্ব্বাণ-পদ লাভের উপযুক্ত করিতে যথাযোগ্য যত্ন লইতে লাগিলেন, কারণ বলহীনের সেই পদ লাভ অসম্ভব। শুক্লাচতুর্দ্দশী রাত্রের শেষভাগে গৌতম পর পর বহু স্বপ্ন দর্শন করিলেন। সকল স্বপ্নই শুভাগমনের ইঙ্গিত করিতেছে দেখিয়া তিনি পরম পুলকিত হইলেন।

এতদঞ্চলে সেনানি নামা জনৈক মান্য ও ধনশালী নাগরিক ছিলেন। রূপ-গুণ সম্পন্না সুজাতা তাঁহার একমাত্র কন্যা। কোন সময়ে সুজাতা মনোমত স্বামী এবং প্রথমেই পুত্র সন্তান লাভ করিলে নিকটস্থ বৃক্ষদেবতা সমীপে সহস্রমুদ্রা ব্যয়ে ভোগ দিবার মানত

* আড়ার কালাম। † রুদ্রক।
‡ উরু—বালুকা।

* গৌতমের নামকরণের দিনে যিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

করিয়াছিলেন। যথাসময়ে সুজাতার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সুজাতা বহু দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করিলেন। এক সহস্র গাভীর দুগ্ধে পাঁচশতকে, সেই পাঁচশতের দুগ্ধে আড়াইশতকে, সেই আড়াইশতের দুগ্ধ ১২৫টীকে এইরূপে (৬৭, ৩২, ১৬) শেষ ষোলটি গাভীর দুগ্ধে আটটি গাভীকে পুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়—দুগ্ধমাত্রে পুষ্ট এই আটটি গাভীর শ্রেষ্ঠ দুগ্ধে তাঁহার মানত পূর্ণ করিবেন। বৈশাখী শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথির শেষরাত্রে সুজাতা স্বপ্ন দেখিলেন, পরদিবস তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।

নিশা শেষ হইতে না হইতেই সুজাতা শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মুখ আজ আনন্দোদ্ভাসিত, তাঁহার গতি আজ নৃত্যচপলা, তাঁহার বাণী আজ মধুক্ষরিণী। পাত্র হস্তে সুজাতা গোশালায় প্রবেশ করিলেন। গাভী দোহন করিতে হইল না—পাত্র যথাস্থানে স্থাপন করিবামাত্র তদুপরি দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ সুজাতা স্নানান্তে পট্টবেশ পরিধান করিয়া পায়সান্ন প্রস্তুত করিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। সুজাতা পাক চড়াইলেন। তাঁহাকে আর কিছুই করিতে হইল না—অলক্ষিতে থাকিয়া দেবগণ সমস্তই করিয়া দিলেন। সুজাতা অবাক হইয়া গেলেন। তিনি পরিচারিকা পূর্ণাকে পূত-পাদপের তলদেশ মার্জ্জনা করিতে আদেশ করিলেন।

এদিকে প্রভাত হইতেই আনন্দ-বিভোর গৌতম ঐ বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহ হইতে দিব্য জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। আজ স্বতঃই অভীষ্ট সিদ্ধির কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইতেছে। সম্মার্জ্জনীহস্তে পূর্ণা আসিয়া এই দীপ্তিমান মহাপুরুষকে দেখিয়া নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে আত্মস্থা হইয়া ছুটিয়া গিয়া সে সুজাতার নিকট এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের কথা বিবৃত করিল। উৎফুল্ল আবেগে সুজাতা পূর্ণাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তিনি পূর্ণাকে আপন দুহিতারূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে উপযুক্ত রত্নালঙ্কারে ভূষিতা করিলেন। স্বর্ণথালে পায়সান্ন মাথায় বহিয়া পূর্ণা ও সঙ্গিনীগণসহ সুজাতা লীলায়িতগতিতে বৃক্ষ-সমীপে অগ্রসর হইলেন। দূর হইতে ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের অপরূপ রূপচ্ছটা দেখিয়া সুজাতার অন্তর অপূর্ব্ব ভাবাবেশে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সুজাতা সমীপস্থ হইবামাত্রই নিমীলিতনেত্র গৌতম আপন কমণ্ডলুর জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন; সুজাতা সুযোগ পাইয়া স্বর্ণথালি তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। গৌতম চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখাগতা সুজাতাকে দেখিতে পাইলেন।

আহারের সময় দেবতার সম্মুখে থাকিতে নাই। সুজাতা আপনাকে ধন্যা মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন। গৌতম আসন পরিত্যাগ করিয়া নৈরঞ্জনায় অবগাহন করিলেন। পবিত্র ভিক্ষুবেশ পরিধান করিয়া তিনি শান্ত-সংযতভাবে পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিলেন। সুজাতা-প্রদত্ত পায়সান্ন ঊনপঞ্চাশৎ ভাগে বিভক্ত করিয়া একে একে সমস্ত ভাগই তিনি আহার করিলেন। ভাবী ঊনপঞ্চাশৎ দিবসের আহার হইয়া গেল। আহারান্তে বাসনা হইল, অদ্যই বুদ্ধত্ব লাভ হইবে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। 'যদি হয় তবে পাত্র স্রোতের বিপরীতগামী হইবে' মনে করিয়া তিনি স্বর্ণপাত্র নৈরঞ্জনাজলে নিক্ষেপ করিলেন। পাত্র স্রোতের প্রতিকূলে কিছুদূর গিয়া জলমগ্ন হইল। গৌতম পুলকিত হইলেন।

নিকটবর্ত্তী অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি এক শালবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হইলেন। ক্রমে দ্বিপ্রহর অতীত হইল, বৈকাল আসিল, বৈকাল গিয়া সন্ধ্যা আগতপ্রায়; গৌতম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—বুদ্ধত্ব লাভ হইল না ভাবিয়া অস্থির-চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শালবৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিকটস্থ এক বোধিদ্রুমতলে গমন করিলেন। হস্তে তাঁহার জনৈক ব্রাহ্মণপ্রদত্ত এক গুচ্ছ তৃণ। গৌতম উত্তরমুখী হইয়া বৃক্ষের দক্ষিণাংশে দাঁড়াইলেন। মনে হইল উত্তর-দক্ষিণে ভূমি হেলিয়া পড়িয়াছে। বৃক্ষটিকে দক্ষিণে রাখিয়া তিনি যথাক্রমে পশ্চিমে ও উত্তরে গমন করিলেন। কিন্তু সকল দিকেই ভূমি অসমান মনে হইল। সর্ব্বশেষে পূর্ব্বদিকে গিয়া তিনি দেখিলেন, উহা সমভাবেই আছে। বুঝিলেন, পশ্চিমমুখী হইয়া বোধিবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে বসিয়া পূর্ব্বগামী বুদ্ধগণ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবগণ কর্ত্তৃক সুপরিষ্কৃত ঐ স্থানে তৃণগুচ্ছ আসনাকারে বিস্তৃত করিয়া গৌতম দৃঢ়-সংযত ভাবে উপবেশন করিলেন আর প্রতিজ্ঞা করিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥*

এ আসনে বসি' যদি শুকায় শরীর,
ত্বক্, অস্থি, মাংস মোর হয়ে যায় লয়;
তবু মন হেথা তবু রহিবেক স্থির,
যাবৎ সম্বোধি রত্ন লাভ নাহি হয়।

মার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে বাধা দিতে না পারিলে জগতে তাঁহার প্রভাবের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। ভেরী ঘোষণায় তাঁহার যাবতীয় অনুচরবর্গ

* ললিতবিস্তর।

আসিয়া সমবেত হইল। বহুসহস্র সৈন্যসহ মার গৌতমকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বিরাট অভিযান দেখিয়া অসংখ্য দেবগণ গৌতমকে পরিত্যাগ করিয়া ভীত-সন্ত্রস্তভাবে যে যে পথে পারিলেন পলায়ন করিলেন। কেহ কেহ গৌতমের পরাভব নিশ্চিত মনে করিয়া মনঃকষ্টে শয্যাগ্রহণ করিলেন। কেবল প্রবল-পরাক্রম (!) শক্র কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিয়া অন্তরাল হইতে ব্যাপার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

শক্তিমান্ গৌতমকে সম্মুখ হইতে আক্রমণ বিজ্ঞোচিত নহে মনে করিয়া মার পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ স্থির করিলেন। তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে প্রথমে একটি প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা সৃষ্টি করিলেন। বাত্যার অবসানে, গৌতম নিশ্চয়ই কোন সুদূর দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন মনে করিয়া মার বৃক্ষতলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বস্ত্রাংশও স্থানচ্যুত হয় নাই। মার বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। এইবারে তিনি ভীষণভাবে বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অবিশ্রাম বারিধারা গৌতমকে ভাসাইয়া লওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলও সিক্ত করিল না। মারের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইল। তিনি শিলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতপ্রমাণ শিলাখণ্ডগুলি গৌতমের পদতলে পুষ্পরূপে পতিত হইতে লাগিল। মার আর সহ্য করিতে না পারিয়া গৌতমকে ভস্ম করিবার জন্য জলন্ত অঙ্গারবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তপ্ত অঙ্গারখণ্ডগুলি মণিমুক্তারূপে গৌতমের পদতলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আরও তিনটি উপায় পরীক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া মার অন্ধকার সাহায্যে গৌতমকে ভীত ও আত্মহারা করিতে প্রয়াস পাইলেন। চারিগুণ অন্ধকার গৌতমের অঙ্গজ্যোতির সম্মুখীন হইতে পারিল না। এবারে মারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি সৈন্যগণকে প্রাণপণ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন এবং নিজে ঐরাবত গিরিমেখলা আরোহণ পূর্ব্বক গৌতমকে লক্ষ্য করিয়া ভীমবেগে আপনার চক্র ছাড়িলেন। চক্র ছত্রের আকার ধারণ করিয়া গৌতমের মস্তকোপরি ঝুলিতে লাগিল। সমস্তই বিফল হইল দেখিয়া তিনি গৌতমের সমীপস্থ হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গৌতমকে তাঁহার (মারের) আসন ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। বেস্মন্তর জন্মে ব্রাহ্মণ যখন প্রহার করিতে করিতে পুত্রকন্যাকে লইয়া যাইতেছিল, গৌতমের তখন তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল। প্রদত্ত দ্রব্য পুনর্গ্রহণাভিলাষের ত্রুটিফলে আজ মার গৌতমের সমীপস্থ হইতে পারিল। তথাপি গৌতম তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিলেন না।

"আমি পারমিতাগুণবলে ইহা অর্জ্জন করিয়াছি। ইহা যে তোমার তাহার প্রমাণ কোথায়?"

মার আপন অনুচরবর্গকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'ইহারা আমার সাক্ষী'। অনুচরবর্গও সম্মতি জ্ঞাপন করিল। মার জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তোমার সাক্ষী কে?'

'আমার সাক্ষী এই পৃথিবী'।

গৌতম পৃথিবীকে সাক্ষ্য দান করিতে আহ্বান করিলেন। দিগন্ত কম্পিত করিয়া পৃথিবী বলিলেন—হাঁ, 'আমি ইঁহার সাক্ষী'। সেই ভীষণ শব্দে ভীত ঐরাবত মারকে ভূপতিত করিয়া পলায়ন করিল। তাঁহার সমস্ত সৈন্যগণ যে যে পথে পারিল পলাইল। অন্তর্যাতনায় দগ্ধ হইয়া মার স্বগৃহে ফিরিয়া শয্যাশ্রয় করিলেন। মারের পরাজয়ে দেবগণের মধ্যে হর্ষকোলাহল উঠিল। মারকন্যা তৃষ্ণা, রতি ও রাগ সমস্ত অবগত হইয়া পিতাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা তিনজনে বহুসখিগণসহ অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া গৌতমকে সাধনচ্যুত করিতে চলিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত লাস্য-লীলা, সমস্ত বাক্‌চাতুরী ব্যর্থ হইল। ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া ব্যর্থতার গ্লানি বহিয়া তাঁহারা স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। *

রাত্রি সমাগত! প্রথম প্রহরে গৌতম 'পূর্ব্বনিবাস' জ্ঞান (জাতিস্মরত্ব) লাভ করিলেন। দ্বিতীয় প্রহরে তাঁহার দিব্যচক্ষু (সর্ব্বজ্ঞত্ব) লাভ হইল। তৃতীয় প্রহরে তিনি কার্য্যকারণ জ্ঞান (প্রতীত্যসমুৎপাদ) অধিগত করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। নির্ব্বাণ সুখ আস্বাদ মাত্র কোন ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার অপেক্ষা না রাখিয়াই তাঁহার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—

অনেক জাতি সংসারং
সন্ধাবিস্‌সম্ অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো
দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং॥

---

* মার রূপক মাত্র। মানসিক সমস্ত কুপ্রবৃত্তি মাররূপে কল্পিত হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, মার পশ্চাদ্দিক হইতে গৌতমকে আক্রমণ করিতে চাহিল—কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত মনের সম্মুখীন হইতে পারে না, মনকে অসতর্ক পাইলেই অলক্ষিতে তাহারা আক্রমণ করে। মার সর্ব্বদা সাধকের মনে ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ফলতঃ সাধনাবস্থায় কুপ্রবৃত্তির আক্রমণ যেমন প্রবলভাবে অনুভূত হয়, আর কোন সময়ে মানব তাহার পরাক্রম তেমন ভাবে অনুভব করে না। কুপ্রবৃত্তির মূলোৎপাটন প্রয়াসী ব্যক্তিকে অসদ্‌বৃত্তিগুলিও অন্তিম শক্তিতে বাধা প্রদান করে। যে কর্ম্মফল বহুদিনে ভোগ করিতে হইত, তাহাকে মুহূর্ত্তমাত্রে খণ্ডিত করিতে যাইয়াই তাহার শক্তি এমন প্রবলভাবে অনুভূত হয়। কুপ্রবৃত্তির প্রবল শক্তি কাব্যাকারে ফুটাইয়া তুলিতেই, দেবতাদের পলায়ন ইত্যাদি পরিকল্পিত হইয়াছে। অন্ধকার সাহায্যে আক্রমণের অর্থ সাধকমাত্রেই অবগত আছেন।